অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিগনেট প্রেস ॥ কলিকাতা ২০

তাঁব আব-আব দুই মেয়েকে নিয়ে বিনায়কবাবু বিশেষ কৃতকার্য হতে পারেননি, তাই তৃতীয় মেয়ে বীথির বেলায় সরাসরি ঠিক করেছিলেন তাব আর তিনি বিয়ে দেবেন না।

বীথির বডো দুই বোনেব যখন বিয়ে হয়, তখন সমাজেব হাওয়াটা দক্ষিণ থেকে এমন প্রবাহিত ছিলো না, চাপা গুমোটেব মধ্যে থেকে মেয়েদের বয়েস কেমন দেখতে-দেখতে তখন বেড়ে যেতো। ফলকে তখন গাছেই প'কতে দেয়া হতো না, কাঁচা ছিঁড়ে এনে চালের ভাঁড়ে, চারদিকেব অবরুদ্ধ শাসনের গরমে, হাঁপিয়ে তুলে, দিতে হতো তাকে একটা পক্কতার আভা। ভিতরে স্বাদ না থাক, বাইরেটা শোভন হলেই হলো। তখন শুধু মলাটের পাবিপাট্য। বিবাহিতব্যতাই ছিলো তখন বয়সেব একমাত্র লক্ষণ। তাব অতিবিক্ত মেয়েদেব আব কোনো লক্ষ্য তখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

বিয়েটা তাই বলে প্রজাপতিব মৃদুল একটি পাখাব কাঁপনেই ঘটে যেতো মনে কোবো না. ছিলো নানারকম অনুষঙ্গ, নানারকম উৎপাত। ছিলো বরপণ, ছিলো শাশুড়ি। বডো মেয়ের বিয়েতে বরপণ ও জামাইর চার-বছরের পডা-খরচ চালাতে বিনায়কবাবুব পৈতৃক বাড়িখানা মিলায়ে উঠেছিলো, মেজো মেয়েব বেলায় প্রত্যক্ষ তাঁকে পণ দিতে না হলেও অপব পক্ষ আশা করেছিলেন, সেই ফাঁকটা তিনি অন্য কায়দায় ভবাট করে তুলবেন। অর্থাৎ, বরপণ বলে নগদ টাকা যাঁরা নেন না, সেই ক্ষতিটা তাঁরা পূরণ করে নিতে চান গয়না আব দানসামগ্রীতে। গোড়ায়

মুখ ফুটে কিছু বলেন না বটে—ওটা হচ্ছে, আব কিছু নয়, ভদ্র মনেব চতুব উদাবতা—কিন্তু বুক ফেটে যায় তা না পেলে। অতএব মেজো মেযেব বেলায় ববপণ এড়াতে পাবলেও তাব শাশুড়িকে ঠেলে বাখা গেলো না। শোনা যায, খিদেব তাড়নায কড়া থেকে লুকিযে একবাটি দুধ খাওযাব অপবাধে তাকে তাব শাশুড়ি কড়াশুদ্ধ গবম সেই পাচ সেব দুধ এক ঢোঁকে গিলিয়ে ছেড়েছিলেন। আবেকবাব, আদা বাটবাব বেলায় সেটাকে যে আগে ছেঁচে থেৎলে নেয়া দবকাব, সেটা ঠিক ভালো জানা ছিলো না বলে তাব শাশুড়ি শিলেব উপব নোড়া দিয়ে ঠুকে-ঠুকে বাঁ হাতটা তাব আব আস্ত বাখেননি।

চাবদিক দেখে শুনে, বিনাযকবাবু তাই এবাব ঠিক কবেছিলেন, বীথিব তিনি বিয়ে দেবেন না। তাকে তিনি মূল্যবান কবে তুলবেন।

চাবদিক দেখে-শুনে, কেননা ইতিমধ্যে সমাজেব জলবায়ু গেছে বদলে। আব যাতেই কেন না হোক, মেয়েবা বযেসে গেছে এগিয়ে, তাদেব বিয়েব জন্যে হন্যে কুকুবেব মতো দোবে দোবে আব ঘুবে বেড়াতে হয় না। প্রভাত মুখুজ্জেব গল্পেব নাযিকাবা যে বয়েসে স্বামীব জন্যে বিছানা পাতছে, সে-বয়েসে আজকালকাব মেয়েদেব ফ্রক ছেড়ে শাড়িব পবিচ্ছেদই আসেনি। তখনকাব দিনে পাবস্পবিক সখীত্বে মেযেবা যা বলাবলি কবতো, এখনকাব মেয়েদেব পক্ষে তা ভাবতে যাওযাও অশ্লীলতা। এখন থেকে ফল গাছেই একেবাবে পাকে, যতো দিনে না তা আপন দুর্বহ বসঘনিমায মাটিব উপব খসে পড়ে, আপন পবিপূবমান স্বাভাবিকতায। এমনি কবে সমস্ত পবিপ্রেক্ষিতই এসেছে বদলে। বইয়েব দেশে মেযেবা কেবল বড়োই হয়, তাদেব বয়েস আব বাড়ে না। ব্যবসা-বাণিজ্যেব ঘোবতব দুর্দশাব জন্যেই মেয়েদেব যা কিছু এই উড়ন্ত উচ্ছ্বাস।

আরো অনেক কথা ছিলো। উকিল রমানাথবাবুর সেজো মেয়ে কেমন এবার দিব্যি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে বসলো—সামাজিক প্রতিষ্ঠায় বিনায়ক-বাবুর চেয়ে তিনি এমন কিছু অগ্রসর নন। অতএব তাঁর মেয়েকেই বা স্কুলে না দিলে চলে কি করে? তাঁকেও তো পাড়ার মধ্যেই থাকতে হচ্ছে। সুরেন ডাক্তারের মেয়ে বনলতা গানে যে কি একটা সেদিন মেডেল পেয়ে গেলো—এ কথা রুগীর ফোড়া কাটতে এসেও তাঁর বলা চাই। সে-যন্ত্রণা কতোদিন আর সহ্য করা যায় বলো?

বীথিও আর এমনি কিছু বয়ে যেতে আসেনি।

'তুমি ঠিক দেখো,' বিনায়কবাবু দীপ্তমুখে বললেন, 'বীথির কক্‌খনো আমি বিয়ে দেবো না।'

স্ত্রী সবাণী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'তোমার মেয়ের যা ছিরি, তাকে বিয়ে করবার জন্যে বাঙলা-দেশের ছেলেরা সব একজোট হয়ে একেবারে হরধনু ভাঙতে বসেছে! বিয়ে দেবে না মানে, তোমার ওকালতির আর আয় নেই, ঝাঁজরা হয়ে গেছে তোমার পুঁজি-পাটা। বিয়ে দেবে না মানে, যা বাজার-কাল পড়েছে, মেয়ের বিয়ে না দিয়ে নিশ্চিন্তে আজকাল তুমি সমাজে বসবাস করতে পারো। এর মাঝে তোমার কৃতিত্বটা কোথায়?'

বিনায়কবাবু গোঁফ চুমড়ে হেসে বললেন, 'বীথি আমার মেয়ে, সে-ই আমার কৃতিত্ব। রূপবিচারে আজকাল চামড়ার চাকচিক্যটাই প্রধান নয়, বীথি এবার পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে, সে-খবর রাখো? যে সেকেণ্ড হয়েছে -সুরেশ বোসের মেয়ে—তার সঙ্গে ওর একশো-বারো নম্বরের তফাত। ভাবতে পারো একবার, তোমার মা'র বয়সে শুনেছ এমন কাহিনী? এর কাছে তোমার চামড়ার চটক লাগে কোথায়? বুঝলে সে-সব দিন আর নেই, মেয়েদের মাকালত্বে আর কারু মন উঠছে না।'

'এমন একখানা মুখ করে কথা বলছ যেন ওকে তুমি একলাই পেয়েছ কুড়িয়ে, আমি আর ওকে পেটে ধরিনি।' সর্বাণীও মেয়ের কথা ভেবে গর্বে ঝিলিক দিয়ে উঠলেন।

পরীক্ষার নম্বরে মেয়ে তাঁর ছাড়িয়ে গেছে সুরেশ বোসের মেয়ে, কুঞ্জলাল-বাবুর বোন, সীতারামবাবুর ভাই-ঝি।

বিনায়কবাবুর স্ত্রী বলে যতো নয়, বীথির মা বলেই তাঁর বেশি মাহাত্ম্য। কিন্তু পরক্ষণেই গলা নামিয়ে বললেন, 'কিন্তু বিয়ে তুমি একেবারে দেবেই না বা কি করে বল্‌তে পারো? ঐ তো ভাগীরথী সান্যালের মেয়ে—ম্যাট্রিকটা পাশ করতেই কেমন এক সাব-রেজিস্টারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো।'

'রাখো! সাব-রেজিস্টারি আবার একটা চাকরি! মেয়ে যেমন পাশ করেছিলো থার্ড-ডিভিসানে, বরও জুটেছে তেমনি ছ্যাকড়া গাড়ি। যাও, ওর বিয়ের জন্যে এখন থেকে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না,' বিনায়ক-বাবু বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'লেখাপড়া শেখাটা কি বর পাকড়াবার একটা চালাকি পেয়েছ নাকি? জোনাকিরা যেমন আলো দেয় সঙ্গীর খোঁজে, মেয়েরাও কি তেমনি বরের জন্যেই বিদুষী হচ্ছে?'

'না, তা বলছি না,' সর্বাণী কুণ্ঠিত মুখে ঢোঁক গিলে বললেন, 'তবে ওর গুণে মুগ্ধ হয়ে কোনো ভালো পাত্র ওকে পছন্দ করে ফেলতে পারে তো।'

'রাখো,' বিনায়কবাবু আরেকটা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'পছন্দটা যেন আর-বীথির করতে হবে না! ততোদিনে সে ই যেন কিছু গুণাগুণ বিচার করতে শেখেনি।'

তাঁদের কাছে বীথি, বিশেষ করে স্কুলের পরীক্ষায় এ-পাড়া ও-পাড়ার সব মেয়েকে ডিঙিয়ে এবার তার এই ফার্স্ট্‌ হওয়ার পর থেকে, দিনের বেলাকার তারার মতোই দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। আকাশের নীল দূরত্বের

মতো সে ছিলো তাঁদের পৃথিবীর স্বপ্ন। সে-ই যেন দিতে এসেছে তাঁদের নামের অমরতা—তারই মাঝে এতোদিনে যেন তাঁদের প্রেম উঠেছে পর্যাপ্ত, পরিণাম-রমণীয় হয়ে। বীথিকে তাঁরা অপব্যয় করতে পারেন না, দিতে পারেন না তাকে ধূলার ধূসরতা।

বীথিও তাই বেড়ে উঠেছিলো বাপ-মায়ের এই প্রশ্রয়ের অজস্রতায়, তার এলোমেলো খুশির বাতাসে। বেড়ে উঠেছিলো সে তার মনের উজ্জ্বল উন্মুক্তিতে, শরীরের চমকিত প্রফুল্লতায়। তার প্রতীক ছিলো দীর্ঘীকৃত, সর্পিল বেণী, সীমাবদ্ধ, সঙ্ক্ষিপ্ত খোঁপা নয়। তার শরীরের উপর কিশোরকাল থেকেই গুচ্ছ-গুচ্ছ লজ্জার ভার চাপিয়ে দেয় হয়নি, তার শরীর ছিলো নির্মেঘ, নীল একটি দিন, রৌদ্রঝলকিত কৃশ একটি অসিলেখা। কখন কোথা থেকে তার আঁচলের প্রান্তটা এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক ভ্রষ্ট হচ্ছে তার দুই চোখ শুধু তারই সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলো না, তার শরীরে ছিলো না এতোটুকু শারীরিকতা। বনের কিনারে নিজের নির্জনতার ঐশ্বর্যে সে ফুটে উঠেছে একটি অনামী ফুল, তার শুধু ফুটে ওঠার অহঙ্কারে। শুধু লাবণ্য নয়, জীবনকে আস্বাদ করবার গভীর লবণাক্ততা ছিলো তার সমস্ত রক্তে। শুধু দীপ্তিতে নয়, দৃঢ়তায় ছিলো তার উচ্চারণ। দেয়ালের ফোকরে ভীরু ইঁদুরের মতো নয়, তরঙ্গ-ভঙ্গিম সমুদ্রের উপর দিয়ে সিন্ধু-শকুনের মতো সে বাত্যাদীপ্ত দুই পাখা মেলে দিয়েছে। সে বাঁচতে এসেছে, বিকিয়ে যেতে আসেনি।

যে-বয়েসে তার দিদিরা ঝিনুকে করে ছেলেদের দুধ খাইয়েছে, সে-বয়েসে সে মানচিত্র খুলে খুঁজে বেড়িয়েছে কোথায় রয়েছে মোম্বাসা, কে বা ছিলো সেই চেঙ্গিস খাঁ, যে তার ঘোড়া চরাবার জন্যে সমস্ত চীনদেশটাই একদিন সমতল করে দিয়েছিলো, কেমন করে শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে অনন্ত হয়ে ওঠে।

তার বাবাই তাকে স্বপ্ন দেখাতেন। ঘরের জানালা থেকে দেখাতেন তাকে পৃথিবীর ধূসর বিশালতা, তার মনে ধরিয়ে দিতেন অক্ষরের আগুন। শেখাতেন তার ছোট দুটি চোখের তারার মধ্যে বিশাল আকাশ রয়েছে ঘুমিয়ে, সমস্ত পৃথিবী তার করতলে। আগে সে মানুষ, পরে মেয়ে। কি সে না হতে পারে ইচ্ছে করলে, যদি সে পায় ওড়বার জন্যে আকাশ, বাড়বার জন্যে আবহাওয়া? নতুন আর আমেরিকা আবিষ্কার করা না যাক, সে আবিষ্কার করবে তার জীবনের নতুন মহাদেশ। কেঁচোরা কিছু দেখতে পায় না, তাদের চোখ বলে কিছু বালাই নেই, তবু সূর্য উঠতে দেখলেই তারা আতঙ্কে আছে কুঁকড়ে। বীথি হবে সেই লঘুপক্ষ উড্ডীয়মান পাখি, আলোকিত আকাশে যে অগণন মুহূর্তের রঙিন পাখা মেলে দিয়েছে।

বীথিকে তাই তিনি দিয়েছিলেন উদ্দাম একটা স্বাধীনতার অবকাশ, চারপাশে তার শাখা প্রসারিত করে দেবার বিশাল বিস্তৃতি। যে ফুল সত্যি করে ফোটে, সে মাঠেই ফোটে তার স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্বিতায় ঝড় বৃষ্টির ভয়ে তাকে বোতলে এনে পুরে রাখলে তার থাকে না আর সেই বর্ধিষ্ণু বলদীপ্তি। বাপের সঙ্গে সঙ্গে বীথিও ভাবতে শিখেছিলো সে সেই বর্ণহীন সাধারণ দলে নয়, যারা জীবনধারণের উদ্দীপনাকে নমিয়ে নিয়ে এসেছে মাত্র কায়িক যান্ত্রিকতায়, মাত্র একটা দিন যাপনের ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তিতে। সে যে কিছু একটা করতে এসেছে এই কথা সে আয়নায় তার মুখ দেখেই অনায়াসে বলে দিতে পারে। সেই কথা তার বাবা মায়ের দুই চোখের তারায় স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে। তাদের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে সে তার জীবনের মূল্য, তার জীবনের মৌলিকতা। সে স্রোতের ফুলের মতো ভেসে যেতে আসেনি।

'আজ বিকেলে পুলিশ-সাহেবের বাঙলোয় কালেক্টার-সাহেবের সেই ফেয়ারওয়েল পার্টিটা আছে, বাবা। আমাকে সেখানে গাইতে ধরেছে। যাবো?' করতে হয় বলে বীথি একবারটি এসে জিগগেস করলো।

'যাবে বৈকি, তোমার যদি ইচ্ছে করে।'

'সেখানে দু'একটা নাচের জন্যেও বলেছে। আমার সেই গৌরীনৃত্যটা, বাবা। কি বলো?'

বিনায়কবাবু সহাস্য মুখে বললেন, 'লোককে যদি না ই দেখাবে, কষ্ট করে নাচগুলি তবে শিখলে কি করতে? পোজ্‌গুলি সব তোমার মনে আছে তো? যাবার আগে বার কয়েক রিহার্সেল দিয়ে নিয়ো।'

'সব ঠিক মনে আছে বাবা। দেখো, কি রকম ক্যারি করে নিয়ে যাই।' বেণীটা পিঠের উপর থেকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বীথি ছুটে বেরিয়ে গেলো। বীথির পিসিমা মহেশ্বরী সামনেই কোথায় ছিলেন, চোখ কপালে তুলে বললেন, 'তাই বলে এতো বড়ো মেয়েকে তুমি সভায় নিয়ে গিয়ে নাচাবে, দাদা?'

'আহা, কতো ওর বয়েস হয়েছে জিগগেস করি?' সর্বাণী মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'এই আষাঢ়ে সবে ও পনেরোয় পা দিয়েছে। দেখতে একটুখানি একটা খুকি।'

'ঢঙের কথা আর বলো না, বৌদি। এই বয়সেই কোলে তুমি হবেনকে পেয়েছিলে। একটুখানি একটা খুকিই তখন ছিলে কিনা।'

'মেয়েদের ঘাড় থেকে বয়স নামে সেই অতিকায় ভূতটা কখন নেমে গেছে,'

বিনায়কবাবু হালকা ঠোঁটে অস্ফুট একটু হাসলেন, 'আগেকার দিনে উঠোনটা নেহাত বাঁকা ছিলো বলেই মেয়েরা নাচতে পারতো না। নাচটা একটা উঁচু দরের শিল্প-বিদ্যা, তাতে বয়েসের কথাটা আসে কোথেকে ? আর খেলো কতোগুলি হাত-পা ছোঁড়া নয়, দস্তুরমতো দেব-দেবীর নাচ। আগেকার কালে পুণ্যশ্লোকা সতীরাও অনেকে এ-বিদ্যেটা অভ্যেস করেছিলেন। বেহুলার কথা পড়িস্‌নি মহাভারতে ?'

মহেশ্বরীর বিয়ে হয়েছিলো বারো বছর বয়েসে, পনেরোয় পা দিতে-না-দিতেই শাখা-সিঁদুরে জলাঞ্জলি দিয়ে বাপের সংসারে তিনি ফিরে আসেন : উত্তরাধিকারসূত্রে বিনায়কবাবু পেয়েছিলেন তাঁরও রক্ষণাবেক্ষণের ভার। তখন থেকে এই রামায়ণ-মহাভারতই তাঁর একমাত্র পাঠ্য ছিলো—শরৎ চাটুজ্জে তখনো লিখতে শুরু করেননি। রামায়ণ-মহাভারত শাস্ত্র বটে, শাস্ত্র মহেশ্বরীর মাথায় থাকুক, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে তিনি জোর গলায় বলতে পারেন, আগাগোড়া সমস্ত পৃষ্ঠায় বই দুখানি একেবারে নিখুঁত পবিত্র নয়। দেব-দেবীর আচরণ সম্বন্ধে দাদা যেন তাঁকে কিছু বলতে না আসেন।

মহেশ্বরী হাঁ করে বিনায়কবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, 'কিন্তু লোকে শুনলে বলে কি ?'

বিনায়কবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, 'এ শোনবার জিনিস নয়, দেখবার জিনিস। যদি তারা দেখলোই, তবে তারা নাচটারই সমালোচনা করবার অধিকারী, নাচের ভালো-মন্দ নিয়ে নয়, কেননা, তবে তারা গায়ে পড়ে দেখতে গেলো কেন ? নভেল যে পড়ে, সে সেই বইটারই নিন্দে করতে পারে, নভেল পড়াকে কক্‌খনো নয়। আর যারা দেখলোই না, তাদের কথার কোনো যুক্তি নেই, অতএব তাদের কথায় আমাদের কিছু এসে যায় না।'

পুলিশ-সাহেবের বাঙলোয় বিনায়কবাবুর নেমন্তন্ন হয়নি ; না হোক, তবু বীথির জন্যে যেখানে আজ দরজা খোলা, সেখানে, চৌকাঠের এপারে থেকেই তিনি সোজা 'ডেইসে' গিয়ে বসতে পাচ্ছেন !

'কালেক্টার সাহেব আমার নাচ দেখে সোনার একটা মেডেল দিয়েছেন, বাবা !'

রাত করে সভা থেকে ফিরে এসে বীথি বিনায়কবাবুকে সুখে একেবারে বিভোর করে তুললো।

সর্বাণী লেলিহান একটা শিখার মতো সর্বাঙ্গে কেঁপে উঠলেন, 'দেখি, দেখি, তোর পিসিমাকে একটিবার দেখিয়ে দিয়ে আসি। ক' ভরি সোনা আছে মেডেলটায় ? সভার মাঝে সবাইর সামনে গলায় তোকে সেটা পরিয়ে দিয়েছিলো ? কই, বাখলি কোথায় ?'

বীথি খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'এখুনি দেয়নি মা, পরে দেবে বলে ঘোষণা করেছে।'

'দেয়নি ?' সর্বাণীর মুখ এক ফুঁয়ে নিবে গেলো।

বিনায়কবাবু সাহস দিয়ে বললেন, 'সভায় যখন একবার ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, তখন সেটা এসে এই পৌছুলো বলে। যা তা লোক মনে কোরো না, স্বয়ং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট।'

হাতে হাতে সেটা তখুনি না পেয়ে দেখতে-দেখতে সর্বাণীর হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে এলো, 'সে তো এখান থেকে বদলিই হয়ে যাচ্ছে শুনলাম, বয়ে গেছে তার মেডেল পাঠাতে। অতো হাসছিলি যে, না পাঠালে তুই কি করতে পারিস ? ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মামলা করতে পারবি তুই ?'

তবু বীথি হাসে, তার হাসির টুকরোগুলি বর্ষমাণ বৃষ্টিবিন্দুর মতো তার মায়ের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এই হাসি দেখে সর্বাণী মনে-মনে জোর পান। জোর পান মেয়ে তাঁকে

প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করছে বলে। জোর পান, তাঁর নিজের চেয়ে তাঁর মেয়ে আজকাল বেশি বোঝে। জোর পান তাঁর মেয়ের তুলনায় তাঁর আনুপাতিক মূর্খতায়।

তারপর, আশ্চর্য, সত্যি-সত্যি সেই মেডেল এসে একদিন পৌঁছুলো। ছোট নীল একটি মখমলের বাক্সে লাল ফিতেয় বাঁধা গোল একতাল সোনা। সত্যি-সত্যি খাঁটি সোনা, পাকা সোনা, কোথাও এতোটুকু খাদ নেই।

'প্রায় দু'ভরিটাক হবে কি বলো? কি ভারি!' হাতের চেটোয় নিয়ে মেডেলটা বারে-বারে উল্টে পাল্টে ওজন নিতে-নিতে সর্বাণী বললেন, 'দাম কতো আজকাল সোনার? স্যাকরাকে একবার গিয়ে জিগগেস করে এসো না।'

বিনায়কবাবু কঠিন মুখে বললেন, 'তুমি ওর এই মেডেলটা বেচবে মনে করেছ নাকি?'

'পাগল!' সর্বাণী মেডেলটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরলেন, 'আমি এমনি জানতে চাচ্ছিলাম কতো দাম পড়তে পারে। মজুরি নিয়ে প্রায় ষাট-সত্তর টাকা হবে, কি বলো?' পরে এগিয়ে এলেন মেয়ের দিকে, 'পর্ না, পর্ না, গলায় একবারটি ঝুলিয়ে দে না দেখি। দেখি কেমন তোকে দেখতে হয়।'

বীথি হেসে গড়িয়ে পড়লো, 'তুমি কি ছেলেমানুষ, মা। সামান্য একটা কি মেডেল পেয়েছি, তাই গলায় দিয়ে আমি এখন আবার নাচ শুরু করি।'

তাই হয়তো হবে, মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সর্বাণী নিজেকে তখুনি সংশোধন করেন, মেডেলটা বুঝি বাক্সেই বন্ধ করে রাখতে হয়। বীথি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি বোঝে, নইলে সত্যি-সত্যি আর একটা জলজ্যান্ত সোনার মেডেল পেয়েছে। গলায় না দিক, সবাইকে এমনি দেখাতে কি দোষ। নইলে মেডেলটা পেয়ে আর কি এগুলো জিগগেস করি?

সর্বাণী চললেন তক্ষুনি সবাইর আগে ঠাকুরঝিকে দেখাতে।

'নাচ একটা খুব খাবাপ জিনিস, না? দেখি কেমন আর তুমি নাক সিঁটকাও। স্বয়ং জেলার ম্যাজিস্টার দিয়েছেন—যা-তা লোক নয়, খাঁটি সাহেব। তাঁর মুখের উপব কথা বলো তোমাব সাধ্য কি!'

তারপব থেকে তাঁদেব বাড়িতে পাড়াব যে কোনো মেয়ে বেড়াতে এসেছে, সর্বাণী সবার আগে তাঁব ট্রাঙ্ক খুলে বার কবেছেন সেই একচাকতি মেডেলটা।

'সেই দিন ম্যাজিস্টার-সাহেবেব সেই সভা ছিল না? সেইখানে নাচ দেখিয়ে খুকি এই মেডেলটা পেয়েছে দেখ। ভু'ভরিটাক হবে, কি বলো, ননীর মা?' বাক্স থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সর্বাণী মেডেলটা সবাইর চোখেব উপর মেলে ধবেন।

'একটু আলগোছে ধবো ছোট বৌ, দামী জিনিস।' সর্বাণী চোখে-মুখে নিদারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'তাই বলে ঠং করে একেবারে মেঝের উপর ফেলে দিয়ো না। বোকা-ছোকা মানুষ, আমবা কি আর এ সবের ব্যবহাব জানি?'

তারপব গলা খাটো কবে লঙ্কর-গিন্নীর কানে, 'ডাক্তাববাবুর মেয়ে—সে তো পেয়েছিলো এক চিলতে একটুখানি রুপো। রুপো না দস্তা কে জানে? আব এ বাবা জেলাব ম্যাজিস্টাব দিয়েছেন!'

সেইদিন সুধীনেব সঙ্গে দেখা হলেও সর্বাণীব মুখে সব-প্রথমে এই কথাটাই বেবিয়ে এলো।

'হপ্তাখানেক হলো বাড়ি এসেছ শুনছি, কই, একবারটি তো আমাদের ওখানে গেলে না। খুকিব মেডেলটা তো দেখে এলে না গিয়ে।'

সুধীন মোক্তাব বামহরিবাবুব বড়ো ছেলে, কলকাতাব কলেজে বি-এ পড়ে। এক পাড়াতেই থাকে, এইটুকু থাকতে জানাশোনা। এক বাড়ির

খেতে নতুন তবকাবি উঠলে পাশের বাড়িতে তাব ভাগ যায়। রামহবিবাবুব বাড়িতে গিয়েই তাকে তিনি আজ মুখোমুখি ধবে ফেললেন। নেহাত মেডেলটা আঁচলে কবে বেঁধে নিয়ে আসা যায় না। সর্বাণী হাঁসফাঁস কবতে লাগলেন।

সুধীন অবাক হয়ে বললে, 'কেন, এসেই তো গেছি আপনাদেব বাড়ি। কালও সন্ধেব সময়। বীথিব সঙ্গে কতো গল্প কবে এলাম।'

'কখন গেলে? বা বে, মেডেলটা তো আমাবই ট্রাঙ্কে, খুকি তো আমাকে সে-কথা কিছু বললে না!'

'আমাকেও হয়তো বলতে ভুলে গিয়েছিলো,' সুধীন হাসিমুখে বললে।

'এ আবাব কি বকম কথা! কালও গিয়েছিলে সন্ধেব সময়, অনেক গল্প কবে এসেছ বলছ, অথচ—' কথাটা কি বলে যে শেষ কববেন সর্বাণী কিছু ভেবে পেলেন না।

'দেখ, দেখ তোমার মেয়ের কীর্তি!' আবার একটা এক্সারসাইজ খাতা হাতে নিয়ে সর্বাণী স্বামীর কাছে ঘন হয়ে এসে দাঁড়ালেন। ভয়ে তার সমস্ত মুখ গোল হয়ে উঠেছে।

বিনায়কবাবু সন্দিগ্ধ চোখে বললেন, 'কেন, কি হলো?'

'দেখ, খাতায় এ-সব কি লিখেছে খুকি,' চিন্তিত, ঝাপসা গলায় সর্বাণী বললেন, 'বোধ হয় কবিতা। দস্তুরমতো মিলিয়ে-মিলিয়ে লিখেছে। এ আবার ওকে কে শেখালো?'

'দেখি, দেখি,' বিনায়কবাবু খাতাটা কেড়ে নিয়ে বিস্ফারিত চোখে পড়তে শুরু করলেন। উৎসাহে উঠলেন ঢেউয়ের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে, 'এ যে দস্তুরমতো ভালো জিনিস। বলো কি, এসব বীথি লিখেছে?'

'হ্যাঁ, ওর টেবিলের ওপর খোলা পড়ে ছিলো। টেবিলটা গুছিয়ে দিতে গিয়ে চোখ পড়লো, দেখলুম পদ্য করে লেখা, বড়ো বড়ো অক্ষরে,' স্বামীর আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে সর্বাণী ভরসা পেলেন, 'সত্যি বলছ, এ ভালো জিনিস?'

'ভীষণ ভালো। আমি তো ভাবতেই পারছি না বীথি এ রকম লিখতে পারে—এতো বড়ো বড়ো ভাব অথচ কোথায় এতোটুকু একটা ছন্দ-পতন হয়নি?' বিনায়কবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন, 'তুমি এ লেখাগুলি দেখে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলে?'

'ভয় পাবো না? মেয়েছেলে শব্দ মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতা লিখছে, এ একটা ভয়ের কথা নয়? আমাদের সময় হলে—'

'সে-সময় আর নেই, যেমন নেই আর মেয়েদের নাকে নোলক, সেই পাছা-পেড়ে শাড়ি—তোমাদের সময় যে-সব প্রচণ্ড ফ্যাশান ছিলো। তা ছাড়া,' খাতার পৃষ্ঠাগুলো একের পর এক উল্‌টোতে-উল্‌টোতে বিনায়কবাবু বললেন, 'তা ছাড়া দস্তুরমতো উঁচুদরের কবিতা—এটা, এটাতে তো প্রায় শঙ্করাচার্যের ফিলসফি দেখতে পাচ্ছি। শোনো—'

বিনায়কবাবু সুর করে কবিতাটা পড়তে লাগলেন, আর সর্বাণী ডিমের মতো নিটোল মুখ করে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

'আর এই দেখ শরৎকাল নিয়ে একটা লিখেছে, কথামালার সেই শৃগাল আর সারস নিয়ে, দস্তুরমতো শক্ত কাজ তাকে কবিতায় নিয়ে যাওয়া, ওদের ইস্কুল নিয়ে, মাতৃভক্তি নিয়ে—তুমি বলো কি,' বিনায়কবাবু উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন, 'আর এই দেখ পরম পিতা ঈশ্বরকে নিয়ে কবিতা। তুমি বলো কি! এতো অল্প বয়েসে এমন প্রতিভার কথা তুমি কোথাও শুনেছ? এমন সব উপদেশপূর্ণ ভালো-ভালো কবিতা, আর তুমি এসেছিলে বীথির নামে আমার কাছে নালিশ করতে।'

সর্বাণী আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি কি জানি মেয়েছেলে কেউ এমন ভালো-ভালো বড়ো বড়ো কথা লিখতে পারে কখনো? আমাদের সময় হলে তো কেলেঙ্কারির শেষ থাকতো না। তখন দু' এক লাইন বা যদি কেউ কবিতা লিখতো, নেহাত স্বামীর চিঠিতে। তাই তো অতো ভয় পেয়ে গেছলুম। আমাদের সময় হলে—'

বিকেল বেলা ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে বীথিকে বিনায়কবাবু ডেকে পাঠালেন।

'তুমি এতো সব চমৎকার কবিতা লিখেছ, আমাকে দেখাওনি কেন?'

বীথি লজ্জায় দেয়ালের সঙ্গে মিলে গেলো। যেন মন্দিরে ঢুকে দেবতার বিগ্রহ ছুঁতে এসে আপাদমস্তক সে পাথর হয়ে গেছে।

অপরাধীর মতো ম্লান মুখে বীথি বললে, 'ভারি বিশ্রী হয়েছে, বাবা। ও কেন তুমি দেখতে গেলে ?'

'আমার মেয়ে বলে তোমাকে কিছু বাড়িয়ে বলছি মনে কোরো না। চমৎকার হয়েছে, মার্ভেলাস হয়েছে। মার্ভেলাসে কিন্তু দুটো এল্, তা মনে রেখো, বীথি।' মাঝখানে বিনায়কবাবু একটু মাস্টারি করে নিলেন, 'যেমন শব্দচয়ন, তেমনি ছন্দজ্ঞান। আমি দস্তুরমতো অবাক হয়ে যাচ্ছি এ-শক্তি তুমি কোথায় পেলে ? আমি তো কোনোদিন জলের সঙ্গে বেল পর্যন্ত মেলাতে পারলুম না।'

বীথির মনে হতে লাগলো সে কেন এর চেয়েও আরো ভালো লেখেনি ? মনে হতে লাগলো, কবে সে আরো ভালো লিখতে পারবে ?

'এ একটা খুব বড়ো গুণ, এর চর্চা কখনো ছেড়ো না। যখনই ফাঁক পাবে, তখনই লিখতে বসে যাবে—তাই বলে পড়াশুনায় যেন ঢিল দিয়ো না। ডু নট নেগলেক্ট ইয়োর স্টাডিজ। মানকুমারীর পর বাঙলা-দেশে আর মেয়ে কবি জন্মালো না। তোমারও তারই মতো প্রায় ডিক্‌শান—ডিক্‌শান্-কথাটার বানান জানো তো ?'

বীথি লজ্জায় ঘাড় নোয়ালো।

'আগের দিনে মেয়েদের নিজেদের বলে কাগজ কালি কেনবার পয়সা ছিলো না, ছিলো না নিজেদের বলে আলাদা একটা ঘর—কবিতা লিখবে কি করে ? ভাগ্যক্রমে তুমি সেই যুগটা পার হয়ে এসেছ, এসেছ আমাদের সংসারে। তুমি সমস্ত বাঙালী মেয়ের মুখোজ্জ্বল করবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও। তোমার কাছ থেকে কতো আমরা আশা করি, বীথি।'

বিনায়কবাবু ঘরের মধ্যে দ্রুতপায়ে খানিকটা পাইচারি করে নিলেন। ফের বলতে লাগলেন, 'লিখবে, লিখবে, আরো লিখবে, বেশ ভালো ভালো সদুপদেশ থাকে, ঐশ্বরিক ভাব থাকে, প্রকৃতি-বর্ণনা থাকে—

নবীন সেনের সেই পলাশীর যুদ্ধ পড়োনি—সেই : কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল, কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি। গ্রোরিয়াস্ কবিতা, গ্রোরিয়াস্-এ আবার একটা এল্—থামবে না কোনদিন। আমি সমস্ত তোমার ছাপিয়ে দেবো, দেখো।'

'ছাপিয়ে দেবে?' বীথি যেন কথাটা বিশ্বাস করতে চাইলো না, 'কোথায়?'

'কেন, মহার্ণব পত্রিকার সম্পাদক জাহ্নবীবাবু আমার মাস্টার ছিলেন, আমার মেয়ে কবিতা লিখেছে শুনলে তিনি গ্ল্যাডলি ছেপে দেবেন। নাই বা যদি ছাপেন,' বিনায়কবাবু বাঁ হাতের উপর ডান হাতে একটা ঘুঁষি মারলেন, 'আমি এখানকার বার্তাবহ প্রেস থেকে ছেপে নিজে বই করে বার করবো। এমন জিনিস লোকে পড়বে না? তুমি লিখে যাও, ছাপাবার জন্যে তোমার ভাবনা নেই। কিন্তু একটা কথা মনে থাকে যেন, বীথি,' বিনায়কবাবু চোখের উপর ভুরু দুটো ঘনিয়ে তুললেন, 'পড়াশোনায় যেন ঢিল দিয়ো না। ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক, প্লে হোয়াইল ইউ প্লে।'

সেই দিন থেকে বীথির কবিতার খাতাটা বিনায়কবাবুর বগলের তলায়। সন্তর্পণে সেটাকে তিনি তার বার লাইব্রেরিতে নিয়ে গেছেন। উকিল মহলে একদিনেই তার প্রতিপত্তির তাপমান অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। ব্রিফের বদলে তার হাতে তার মেয়ের কবিতার খাতা।

দেবীদাসবাবু গম্ভীর, গদ্গদ মুখে বললেন, 'সত্যিকারের জিনিয়াস আছে বটে। কি জানি সেই ইংরেজ মেয়ে কবির নাম, সেই যে দি বয় স্টুড অন দি বার্নিং ডেক লিখেছিলো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিসেস হেমান্স, মিসেস হেমান্সের মতো চমৎকার।'

বিনায়কবাবু কুটিল চোখে বললেন, 'আর প্রকৃতি-বর্ণনা? এই যে, শোনোই

না এখানটা। শরতের পর শীত এসেছে—শোনোই না একবার, আমাদের তখন কি অবস্থা হয়।'

মণীন্দ্রবাবু বললেন, 'বুড়ো বয়েসে নিজে কবিতা লিখে মেয়ের নামে চালাচ্ছেন নাকি? নইলে এমন মিল, এমন কঠিন-কঠিন শব্দ, এমন সারগর্ভ সব কথা—সেকেণ্ড ক্লাসের মেয়ের পক্ষে একটু যেন কেমন-কেমন ঠেকছে না? কি বলো হে, কেষ্টকমল?'

বিনায়কবাবু ঘোরতর প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনো তেলে-জলে মেলাতে পরেলো না, তার আমি লিখবো কবিতা!'

কৃষ্ণকমলবাবু টিপ্পনি কাটলেন, 'তা, মেয়ে ও তো তোমারই মেয়ে।'

'তাই তো ভেবে অবাক হচ্ছি, এ জিনিয়াস ওর এলো কোত্থেকে?'

সুবিধেমতো যাকে হাতের কাছে পাচ্ছেন, যার কাছে তিনি চান বা মনে মনে একটু মর্যাদাবান হতে, তাকেই ধরে বিনায়কবাবু মেয়ের কবিতা পড়িয়ে শোনাচ্ছেন। নদীর ধারে, ল্যাম্প পোস্টের নিচে, বাজারের রাস্তায়।

প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদের মধ্যে একমাত্র মুন্সেফবাবুই তাঁর নাগালের মধ্যে। সেদিন সকালবেলা সটান তাঁর বাড়িতে গিয়েই তিনি হাজির।

কথায়-কথায়:

'এই দেখুন আমার মেয়ের কবিতা। এই এটা আগে পড়ুন, নদী নিয়ে লিখেছে।'

টাকে হাত বুলুতে-বুলুতে মুন্সেফবাবু বললেন, 'আমার মেয়ের কাছে আপনার মেয়ের কথা শুনেছি। শুনেছি অসাধারণ মেয়ে। লেখা পড়ায়, নাচে-গানে, সব দিকে অসামান্য। কবিতার আমি কিছু বুঝি না, মশাই, কোল্ড ফ্যাক্ট, তবে এই আসচে মাঘে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে,

আপনার মেয়েকে সেই উপলক্ষে দয়া করে যদি একটা প্রীতি-উপহার লিখে দিতে বলেন—'

'ও, মাঘ মাস?' বিনায়কবাবু সামনের টেবিলের উপর একটা চড় মেরে বসলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। অনায়াসে, একশো বার লিখে দিতে পারবে—শীতকাল সম্বন্ধে ওর স্টকে খুব ভালো-ভালো আইডিয়া আছে—এই যে সাতাত্তর পৃষ্ঠায়।'

বীথির প্রথম কবিতা বেরুলো এই শহর-থেকে-ছাপা, প্রুফের কাগজে ছাপা, সাপ্তাহিক 'দর্পণে'। কবিতার নামের পাশে ফুটকি দিয়ে নিচে রুল টেনে তার তলায় তার বাবার নাম ও তার বয়সের সংখ্যাটা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

লজ্জায় বীথি আমর্মমূল বিবর্ণ হয়ে গেলো। এর জন্যে ততো নয়, যতো, সে কেন এর চেয়ে আরো ভালো লিখতে পারলো না। কবে সে আরো ভালো, মনের মতো করে লিখতে পারবে? প্রকৃতি কি অনুভব করছে, তাতে তার কি এসে যায়? সে সত্যি-সত্যি কি অনুভব করছে, এই মুহূর্তে, বুক ভরে এই নিশ্বাস নিতে-নিতে, তাই যদি সে না লিখলো, তার হয়ে সে-কথা তবে আর কে লিখে দিয়ে যাবে বলো?

কিন্তু, কাগজের থেকে কলম তুলে বীথি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে, নিজের মনের নীরব কথাটি ভাষায় হুবহু প্রকাশ করা কি ভয়ানক শক্ত কাজ!

ছোট এই এক্সারসাইজ খাতাখানি নিয়ে বীথির এতোদিন সঙ্কোচের অন্ত ছিলো না—তার এই সঞ্চীয়মান যৌবনের সঙ্কোচ। কারুর চোখের সামনে তার একটি পৃষ্ঠা মেলে ধরা মানে তারই যেন আশরীর অনাবরণ। তাই বাবা যখন তাকে কবিতার জবাবদিহি দেবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, লজ্জায় ও ভয়ে সে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো, মাটির অসহায়তায়।

ছাপার অক্ষরে দেখা তা বরং কতো সহজ, কতো পরিচ্ছন্ন, কিন্তু হাতের লেখায় আঁকাবাঁকা তার ঐ ক'টি অস্পষ্ট কাটাকুটিতে তার সমস্ত লজ্জা সমস্ত গোপনতা যেন ধরা পড়ে গেছে।

আশ্চর্য, তাই বলে এতোটা সে কখনো ভাবতেও পারতো না। তিরস্কার করা দূরের কথা, বাবা সামান্য একটা ভ্রূকুটি পর্যন্ত করলেন না। মা'র মুখ যা একখানা হাঁড়ির মতো থমথমে হয়ে উঠেছিলো, এক নিশ্বাসে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর সমস্ত কুয়াশা। দু'হাত তুলে বাবা তাকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন, অকৃপণ রৌদ্রের মতো তাঁর আনন্দ দিলেন ঝরিয়ে। বইয়ে দিলেন উৎসাহের ঝড়, বিদ্যুদ্দাম বিজ্ঞাপন।

পৃথিবীর কোন নবীন কবি তার প্রথম কাব্যারাধনার সূচনায় এমন দিগন্তবিস্তৃত অভ্যর্থনা পেয়েছে? বিশেষতো মেয়ে হয়ে, বুক ফাটলেও যাদের মুখ ফোটবার কথা নয়। সবাণীর ভাষায় বলতে গেলে, যাদের কবিত্বের এলাকা স্বামীর চিঠির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু বীথির বেলায় হঠাৎ এই উত্তপ্ত পক্ষপাত কেন? কেন এই প্রশংসমান কলগুঞ্জন? সে এমন কি আর ভালো লিখেছে?

ভালো না লিখুক, তার লেখবার বিষয়গুলি তো ভালো। সে নদী নিয়ে লিখেছে, মাতৃভক্তি নিয়ে লিখেছে, শৃগাল আর সারসপক্ষী নিয়ে লিখেছে। মেয়েদের বেলায় এর অতিরিক্ত আর কি দেখবার থাকতে পারে? তারা কি, তাই যথেষ্ট তারা কেমন, তা নিয়ে কেউ বিচার করতে আসে না। কি নিয়ে তারা লিখলো, কেমন করে তারা লিখলো নয়।

কিন্তু তেমন করে বীথি কবে লিখতে পারবে?

সেই দিন থেকে বিনায়কবাবু কেবল তাকে মৃদু মৃদু টোকা মারছেন, 'তারপর আর কি লিখলে, বীথি? এখন তো দিব্যি গরম এসে পড়েছে—

এবার একটা গ্রীষ্ম নিয়ে লিখে ফেল না। গ্রীষ্মকালে খুব ভালো প্রকৃতি-বর্ণনা করার সুবিধে।'

লজ্জায় বীথির ঘাড়টা ছোট হবে শক্ত হয়ে এলো, 'এখন আর কিছু লিখতে পাচ্ছি না, বাবা।'

'না, না, আইডিয়া না এলে লিখবে কোত্থেকে? এ তো আর মুখস্ত করা নয় যে জোর করে খানিকটা গিলে ফেললেই হলো। এ হচ্ছে, কোথাও কিছু নেই, খানিকটা শূন্য থেকে একটা তারা সৃষ্টি করে তোলা। রেডি থেকো, সব সময়ে রেডি থেকো, কখন কোত্থেকে আইডিয়া এসে যাবে তুমি টেরও পাবে না। সময় বয়ে যেতে দিয়েছ কি, হয়তো আর একটি তারাই ফুটলো না তোমার আকাশে।' বিনায়কবাবু যাবার আগে ও-পাশের জানলাটা খুলে দিয়ে গেলেন, 'ক দিন থেকে কি গরমই যে পড়েছে!'

কিম্বা পরো, সেই দিন, বীথি যখন লণ্ঠনের আলোয় টেবিলের সামনে হেঁট হয়ে বসে কি লিখছিলো।

পিছন থেকে চোরের মতো চুপি চুপি বিনায়কবাবু কখন ঢুকে পড়েছেন। ভয়ে বীথি প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসবার যোগাড়।

খাতার উপর গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে বিনায়কবাবু বললেন 'কিছু লিখছো নাকি?'

'হ্যাঁ বাবা, একটা ট্রানস্লেশান করছিলুম।'

'ভালো কথা, খুবই ভালো কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা কবিতাও লিখো মনে করে। এ সাঁতার শেখা নয় যে একবার শিখলেই অনায়াসে ভেসে থাকা যাবে। চর্চা চাই সাধনা চাই—চর্চা না থাকলে সমুদ্রের সমুদ্র থেকে একটি মণি মুক্তোও তুমি তুলে আনতে পারবে না।'

'আমার পরীক্ষা যে বাবা খুব কাছে এসে পড়লো।'

'তা তো ঠিকই। আগে পড়া তার পর লেখা, না পড়লে তুমি লিখবে কোত্থেকে? তবে একটা কথা, বীথি, শোনো, একটা কবিতা আমাকে তোমার লিখে দিতে হবে কিন্তু।' কথাটা একটা কাতর আবদারের মতো শোনালো।

বীথি অল্প একটু হাসল, 'কি নিয়ে?'

'আমাদের সেকেণ্ড মুন্সেফ এই এপ্রিলে বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর ফেয়ারওয়েল নিয়ে—মনে থাকে যেন ফেয়ারওয়েলে দুটো এল্, আর ওয়েলফেয়ারে একটা। পারবে না লিখে দিতে?'

'আমি যে তাঁকে চিনি না বাবা, কোনোদিন দেখিওনি।'

'তোমাকে দেখতে হবে না। কি-কি লিখতে হবে, তার কোয়্যালিফিকেশান্স—সব আমি তোমাকে লিখে দেবো পর-পর। তার পর তুমি সেগুলোকে সুন্দর করে মিলিয়ে দেবে—কতোক্ষণ আর লাগবে তোমার? তারপর পড়াশুনো, হ্যাঁ, খবরদার, পড়াশুনোয় যেন তাই বলে ঢিল দিয়ো না।'

সম্মতিতে বীথি আরক্ত হয়ে উঠলো।

তার আপত্তি করা উচিত নয়। বিষয়টাকে সত্যি ভালোই বলতে হবে।

না, কবিতা লেখার জন্যে বীথি ক্লাসের পড়ায় একতিল ঢিল দেয়নি। দস্তুরমতো গলা ছেড়ে সে মুখস্ত করেছে। এবারও সে প্রথম হয়ে ফার্স্ট-ক্লাসে প্রমোশান পেলো। এবার পেলো চার টাকা করে বৃত্তি।
সংসারের দস্তুরমতো আয় বেড়ে গেলো বলতে হবে—সর্বাণীর এটা-ওটা খুচরো হাত-খরচ। এমন-কি, পোস্ট আপিসে বীথির নামে খোলা হলো ছোট একখানি খাতা। সে-টাকা তুলতে হলে বীথির দস্তুরমতো সই চাই।
'কি মজবুত জমি দেখেছ এ শাড়িটার!' সর্বাণী পাড়ার পোস্ট মাস্টারের স্ত্রীর দিকে শাড়ির পাড়ের কাছটা আঙুলে করে তুলে ধরেন, 'কতো বললুম, বুড়ো বয়েসে এতো টেঁকসই শাড়ি পরবার আমার কি হয়েছে। তা, বীথি কিছুতেই শুনবে না, নিজে দোকানে গিয়ে কিনে এনেছে দেখ না—দু' টাকা বারো আনা করে জোড়া। চার টাকার মধ্যে দু' টাকা বারো আনা-ই যদি তুই বার করে দিলি, তবে তোর নিজের জন্যে আর থাকলো কি?'
এই টাকাটাতেই মা এমন আথালি-পিথালি করছেন, বড়ো হয়ে বীথি যখন চাকরি করবে, তখন কি না জানি হবে। কি আবার হবে—সে ফিরিয়ে দেবে সংসারের এই কাতর চেহারা, তখন সামান্য এই চার টাকা বাজিয়ে মাকে এমন স্ফূর্তি করতে হবে না।
দ্বিগুণতর উৎসাহে বীথি বইর উপর ঝুঁকে পড়লো। তার শেষ পরীক্ষার দিন এখন প্রায় আঙুলে গোনা যায়।

পড়া নিয়ে এমনি একটা তাড়াহুড়োর সময় বীথির কানে এলো পাশের বাড়ির উমাশশীকে কারা মেয়ে-দেখতে এসেছে।

উমাশশী তার সঙ্গে পড়ে, একই ক্লাসে, নম্বরের দৌড়ে চলছিলো প্রায় তার কান ঘেঁষে। পরীক্ষার আর মাসখানেকও বাকি নেই, সে কিনা এর মধ্যে, এতো সকালেই কুপোকাৎ।

মজা দেখবার জন্যে বীথি লুকিয়ে চলে গেলো ও-বাড়ি। আর-আর মেয়েদের সঙ্গে সে-ও জানলার ফাঁকে উঁকি মারলে।

উঃ, সে কি বীভৎস নারকীয়তা! জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে বীথির সমস্ত গা জলে যেতে লাগলো। উমার খোঁপাটা পিঠের উপর ভেঙে ফেলে দেখছে তারা তার চুলের কতোখানি দৈর্ঘ্য, কিম্বা খোঁপার ভেতর মোজা লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা, হাতে নিয়ে অনুভব করছে তার কেমন মসৃণতা। হাটিয়ে-হাঁটিয়ে দেখছে তার চলার চাপল্য। মুঠোর মাঝে করতল তুলে নিয়ে ওজন করছে তার লালিত্য ও লজ্জা, চামড়ার ওপর আলগোছে একটু আঙুল ঘষে পরীক্ষা করছে তাতে কিছু মেকি পালিশ আছে কিনা। দেখছে তার দাঁতের কোনো দোষ আছে কিনা, হাসিয়ে দেখছে তার মাড়িটা কতোদূর পর্যন্ত দেখা যায়, চেয়ারে না বসে উবু হয়ে বসবার সময়—যেমন ধরো, সে যখন গ্রামে গিয়ে পিঁড়ে লেপবে বা ঘাটে বসে বাসন মাজবে—তখন সে কতোটা শ্রীমতী হয়ে ওঠে।

আর কি সব জঘন্যতরো প্রশ্ন!

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির নাম করো। ইংরিজিতে মজঃফরপুরের বানান কি? কনটিনুয়াস আর কনটিনুয়ালের তফাত কোথায়?

আশ্চর্য, উমাশশী কোথাও এতোটুকু প্রতিবাদ করলো না। হাঁটলো, দাঁত দেখালো, ওঠ বোস করলো। একটা প্রশ্নেও একচুল ঠেকলো না। এতো সব যেন সে পড়ে রেখেছিলো এই পরীক্ষাটাই উৎরে যেতে।

কিন্তু দেখে-শুনে বীথির সমস্ত স্নায়ু-শিরা বিষাক্ত সাপের মতো উঠলো কুণ্ডলী পাকিয়ে।
ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে উমাশশীকে সে পাকড়াও করলে। ঝাঁজালো গলায় বললে, 'তুই কি বাজারের একটা জিনিস, বাইরের শো-কেসে সাজানো, যে, যে সে যখন-খুশি এসে নেড়ে-চেড়ে তোকে যাচাই করে যাবে? শরীরে তোর রক্ত নেই, তুই মানুষ নোস?'
উমাশশী ম্লান হেসে বললে, 'নইলে কি করে আর আমাদের বিয়ে হতে পারে বল্?'
কথাটা বীথিকে একটা ধাক্কা দিলো। তবু জেদি গলায় বললে, 'নাই বা হলো বিয়ে। তার জন্যে আমাদের হাত টিপে টিপে দেখবে, বলবে, হাঁ করো, তোমার দাঁত দেখি? এ কি কসাইখানায় একটা মাংসের দোকান পেয়েছে নাকি? তোর একটা আত্মসম্মান নেই? বিয়ে হবে বলেই তুই তোর সম্মান খোয়াবি নাকি? মেয়েদের সমস্ত সতীত্ব বুঝি কেবল বিয়ের পরে থেকেই আসে, বিয়ের আগে আর তার কোনো বালাই নেই, না?'
কথার ঝাপটায় উমাশশী একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো। নির্জীব গলায় বললে, 'তা আমি কি করতে পারি? ওরা ভদ্র নয় বলে আমি অভদ্র হই কি করে?'
'তাই বলে তোকে নিয়ে তারা বাঁদর নাচ নাচাবে? নাচতে বললে নাচবি, হাই তুলতে বললে হাই তুলবি?'
উমাশশী করুণ করে বললে, 'বাবা কাকারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা যখন সেইটেই পছন্দ করছেন দেখা যাচ্ছে, তখন, তুইই বল, তাঁদের মুখের উপর আমি গোয়ারতুমি করতে পারি নাকি?'
'পারা উচিত ছিলো। আগে আমরা মানুষ, পরে মেয়ে,' বীথি জোর

গলায় বললে, 'কিন্তু বিয়েটা তো একটা একতরফা জিনিস নয়, তোকে তোর বর যাচাই করে দেখতে দেবে? তোর চুল ছোট বলে যদি তুই অপছন্দের হোস তো তোর বর গোঁফ রাখে বলে তাকে তুই বাতিল করে দিতে পারবিনে কেন? তুই বা কেন তাকে বাজিয়ে নিতে পারবিনে? তোকে যেমন হাঁটিয়ে দেখেছিলো, তেমনি তাকেও বা কেন তুই বলতে পারবিনে, এখান থেকে ঐ পর্যন্ত একটা লং-জাম্প্ দাও?'

এতো দুঃখেও উমাশশী হেসে উঠলো।

'তুই তো হাসবিই, বিয়ের নাম শুনে সারা গায়ে যে তুই পেখম মেলে ধরেছিস। কিন্তু আমার,' বীথি দাঁত দিয়ে চেপে ঠোটের একটা কোণ ধারালো করে তুললো, 'রাগে আর অপমানে আমার সমস্ত রক্ত কালো হয়ে উঠেছে।'

এতে এতো যে কি রাগের থাকতে পারে উমাশশী একনিশ্বাসে যেন তা কিছু বুঝে উঠতে পারলো না।

অসহায়ের মতো মুখ করে বললে, 'বাবা-মা যদি জোর করে বিয়ে দিতে চান, যদি সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়েই দেন ভদ্রলোকের সামনে— আমি যে কি করতে পারি, তখন যে কি করা যায়, আমি তো ভাই কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।'

'তা তো ঠিকই,' বীথি প্রখর চোখে তাকে একটা চিমটি কাটলো, 'রত্নাকর দস্যুও সে কথাই বলেছিলো। কিন্তু, পড়াশুনো তা হলে তুই এখেনেই ছেড়ে দিলি?'

বীথির প্রশ্নটা যেন তাকে বিদ্ধ করলো।

'বিয়ে যদি সত্যিই হয়, তবে কি দাঁড়ায় কেমন করে বলবো?' উমাশশীর চোখ বুঝি বা এলো ঝাপসা হয়ে, 'শেষ পর্যন্ত বোধহয় ছেড়েই দিতে হবে।'

'ছেড়েই দিতে হবে তো ঠাট করে পড়তে গিয়েছিলি কেন ?'

উমাশশী হেসে ফেললো, 'নয় তো বাড়িতে বসে শুধু-শুধু এমনি ধুমসো হবো নাকি ? মাঝের এতগুলি দিন কি করা যায় তবে ?'

'মাঝের এতোগুলি দিন।' বীথি আবার তপ্ত হয়ে উঠলো, 'তবে বিয়ে হবে বলেই লেখাপড়া শিখছিলি ? লেখাপড়া একটা উপায়, উদ্দেশ্য নয় ?'

'কিছু জানি না বাপু, পারিস তো বাবার সঙ্গে লড়ে ত্যাখ,' উমাশশী উঠে পড়লো, বললে, 'যাই কেন না বল্, পরীক্ষাটা না দিয়ে আমি পিঁড়তে গিয়ে বসছি না।'

'যথেষ্ট পরীক্ষা দিয়েছিস।' বীথিও আর বসলো না, বিদ্রূপে উঠলো ঝিলিক দিয়ে, 'শেষকালে তোর যুদ্ধ অন্যকে গিয়ে লড়তে হবে ? যাক, আমি বেঁচে গেছি, উমা,' শরীরের লীলায়িত লঘিমায় বীথি একটা মুক্তির ঢেউ তুললে, 'আমার বাবা-মা কক্ষনো আমার এই অকালমৃত্যু দু' চোখ মেলে দেখতে পারতেন না। আমরা বাচবো বলেই এসেছি, বেচবো বলে নয়।'

বীথি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে গেলো বেরিয়ে। তার বেণীর ত্বরিত চমক তার সমস্ত চলায় একটা ধারালো আভা এনেছে।

শোনা গেলো, পাত্র নাকি শেষ পর্যন্ত উমাশশীকে পছন্দ করতে পারেনি। সেই কথাটাই মহেশ্বরী সাড়ম্বরে দাদা-বৌদিদির কাছে ব্যাখ্যা করছিলেন।

পাশের ঘরে দেয়ালে কান পেতে বীথি সব শুনতে পাচ্ছে।

'গান জানে না যে। খালি একটু বিদ্যের বাহার থাকলেই তো চলে না আজকাল, একটু নাচ-গানও যে জানা দরকার। সব দিক থেকেই সরস্বতী হয়ে ওঠা চাই যে,' মহেশ্বরী একটা ঢোঁক গিললেন, 'আমি বলি কি, আমাদের বীথির সঙ্গে কথাটা একবার পেড়ে দেখি না। আমার

ঠিক বিশ্বাস, ওকে তাদের পছন্দ হবে, নাচে-গানে সোনার মেডেল-পাওয়া মেয়ে—ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে, দেখো।'

নাকের ভিতর দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বিনায়কবাবু বললেন, 'পাগল!'

সর্বাণী বললেন, 'কি যে তুমি বলো, ঠাকুরঝি, সামনে ওর একজামিন।'

'একজামিন বলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না নাকি?' মহেশ্বরী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'বেশ তো, ফাল্গুনটা পেরিয়ে গিয়ে বোশেখে দিন ফেললেই হবে। তখন তো আর মেয়ের পরীক্ষা নেই?'

'তখন ও কলকাতা গিয়ে কলেজে পড়বে না?' কথাটা মুখে বলতেই যেন সর্বাণীর বুকটা দশ হাত হয়ে উঠলো।

'ভালোই তো। ছেলেও তো কলকাতাতেই কাজ করে।'

'কি কাজ?'

'কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় আলো জ্বলে না?—তার ইনস্পেক্টার। একশো টাকা নাকি মাইনে। বেশ ভালো বংশ। এমন পাত্র হাত-ছাড়া কোরো না। আমারই তো দূর-সম্পর্কের মাসতুতো দেওর, আমি যদি বলি—'

হাসতে গিয়ে বিনায়কবাবু আবার একটা শব্দ করলেন।

'কি যে তুমি বলো, ঠাকুরঝি,' ঠাট্টায় সর্বাণীও তাঁর ঠোঁটের প্রান্তটা একটু কুঁচকোলেন, 'খুকির জন্যে একটা একশো টাকা মাইনের পাত্র! তাও কিনা আলোর ইনস্পেক্টার। খুকি আমার এমনি ভেসে এসেছে নাকি?'

মহেশ্বরী জ্বলে উঠলেন, 'তবে খুকির জন্যে তুমি কি এমন হাতি-ঘোড়া চাও জিগগেস করি? এদিকে রণখানা যে দুধে-আলতায় তার খেয়াল রাখো?'

'রঙ দেখে যারা মেয়ে পছন্দ করে, তাদের হয়ে তুমি কিছু বলতে এসো না।'

'বেশ তো,' মহেশ্বরী তবুও হাল ছাড়লেন না, 'একশো টাকায় মন না ওঠে, আমি তিনশো টাকার পাত্র এনে দিতে পারি। যশোর-বনগাঁতে কি সব ব্যবসা করে শুনেছি।'

'বাঙলা-দেশে তুমি আর জায়গা খুঁজে পেলে না?' সর্বাণী ঠোঁট উল্‌টিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিলেন, 'শেষকালে পাঠাই ওকে একটা মেলেরিয়ার ডিপোয়।'

'জায়গা ভালো না হলে কি হবে, ব্যবসার মুনাফার দিকে তো তাকাতে হয়। দস্তরমতো ফ্যালাও ব্যবসা।'

সর্বাণী জিগগেস করলেন, 'কি পাশ?'

'টাকা রোজগার করতে পারলে পুরুষের পাশ-ফেল দিয়ে কি হবে? চিঁড়ে বলো, মুড়ি বলো, ভাতের সমান কিছু নয়।' মহেশ্বরী গলায় বিশেষ উৎসাহ পেলেন না, 'আই-এ পর্যন্ত বোধহয় পড়েছিলো।'

'রেখে দে,' বিনায়কবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, 'আর দুটি বছর অপেক্ষা করলে বীথি তাকে অনায়াসে ছাড়িয়ে যেতে পারবে। তারপর ওর কাছে এসে তাকে পড়ে যেতে বলিস।'

মহেশ্বরী এতোতেও দমলেন না। বললেন, 'বেশ তো, পাশ-করা পাত্রই যদি তোমাদের পছন্দ, তা-ও বা না কোন যোগাড় করা যায় ইচ্ছে করলে?'

'শুধু পাশ-করা হলেই চলবে নাকি?' সর্বাণী টিপ্পনি কাটলেন, 'পকেটটাও একটু বেশ ভারি থাকা চাই।'

'হ্যাঁ, তা-ও দেখতে হবে বৈকি।'

'আর যা-তা একটা চাকরি হলেও হয় না ঠাকুরঝি। পরে বেশ মোটা

একটা পেনসন পাওয়া যায়—বুঝলে না, উঁচু-দরের গভর্ণমেণ্টের চাকরিগুলিই বেশি মজবুত।' সর্বাণী টুক করে একটা ঢোক গিলে গলা নামিয়ে আনলেন, 'ডিপ্‌টি-টিপ্‌টি হলেই বেশ মানায়, শুনতেও কেমন গাল-ভরা। আবার নাচ-গানও একটু বোঝে, তরতরিয়ে কবিতার বেশ মানে বুঝতে পারে—বুঝলে না, যার তার হাতে তো আর এমন মেয়েকে তুলে দিতে পারি না! খরচ-পত্র করে এতো সব ওকে শেখালাম।'

'থামো, ওর বিয়ে নিয়ে এখন থেকে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না,' বিনায়কবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'ও তোমাদের পাঁচি-খেঁদির মতো দেহসর্বস্ব বিয়ের জন্যে তৈরি হয়নি। ওর অনেক আশা, অনেক ভবিষ্যৎ,' বিনায়কবাবু চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলেন, 'এখন থেকেই ওর কেরিয়ার আমি মাটি করে দিতে পারি না। ওর মাঝে যে আগুন জ্বলছে তা দিয়ে তোমাদের উনুন ধরানোর কাজে না লাগালেও চলবে।' পাশের ঘরে মেয়ের কানে পৌঁছুবার জন্যে গলাটা তিনি কয়েক পরদা চড়িয়ে দিলেন, 'জোন অব আর্কের নাম শুনেছ, নাম শুনেছ ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের, মাদাম কুরির?'

বাবার উদ্দীপ্ত কথাগুলি বীথিকে সুরভিত একটা নেশার মতো বিভোর করে তুললো।

দেয়ালের থেকে কান সে প্রায় তখন সরিয়ে নিচ্ছিলো, কিন্তু পিসিমা এর পরেও আবার কি বলতে যাচ্ছেন।

বিয়ে করবে না বলে বিয়ের আলোচনা শুনতে দোষ কি?

মহেশ্বরী বাঁকা গলায় বললেন, 'তাই বলে তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে না বলেই ঠিক করেছ নাকি?'

'আমি মালিক নাকি বিয়ে দেবার? কি জানি সেই কথাটা? জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এই তিনের নেই—ইয়ে।' কথাটা সুবিধেমতো মেলাতে না

পেরে বিনায়কবাবু হেসে ফেললেন, 'যখন হবার তা হবে। নাই হলো তো নাই হলো। তার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরবার কি হয়েছে? সবাই কি এক গোয়ালের গরু নাকি, সবাই এসেছে নাকি চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরতে? বিয়ের চেয়েও অনেক বড়ো কাজ মেয়েদের করবার আছে—সেই বড়ো কাজের ভার বীথির ওপর।' বিনায়কবাবুর পায়ের ধাপগুলো দ্রুততর হতে লাগলো, 'আর বিয়ে যদি একদিন হয়ও, হবে—তাতে আমার কি করবার আছে? আমি ওর কি করতে পারলাম? আমি দিয়েছি ওকে এই প্রতিভা, এই ওর কবিতা লেখবার শক্তি, এই ওর গানের গলা? আমি—আমি—আমার চেষ্টায় কি হবে?'

মহেশ্বরীর তবুও যেন কি বলবার ছিলো, বিনায়কবাবু রূঢ় গলায় ফতোয়া জারি করলেন, 'ওর এই পরীক্ষার সময় বিয়ে-বিয়ে নিয়ে তোমরা এমনি কচাল করতে পারবে না বলে দিচ্ছি। ভালো করে পাশটা আগে ওকে করতে দাও।'

সত্যি, বীথি গা ভরে চমকে উঠলো, পড়ার কথা সে দিব্যি ভুলেই ছিলো এতোক্ষণ। তাড়াতাড়ি চেয়ারের মধ্যে ঘন হয়ে বসে লণ্ঠনটা উস্কে দিয়ে গভীরতর অতলতায় অক্ষরের সমুদ্রে সে ডুব দিলে।

বীথি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে উঠেছে, আর সুধীনও এসেছে কলকাতা থেকে বি-এ দিয়ে।

দগ্ধ দিন যতোক্ষণে না রাত্রিতে গলে যায়—শীতল বিশ্রান্তিতে, সুধীন চুপ করে এসে বসে থাকে বীথির এলোমেলো আলস্যের স্নিগ্ধতায়।

তাদের দুজনের মাঝে কখনো কোনোদিন বাধা বা আড়াল ছিলো না, তাদের আলাপটা ছিলো জলের মতো নির্মল, তাতে না ছিলো ঢেউ, না বা ছিলো স্তব্ধতা। জলের যেমন বিশেষ কোনো রঙ নেই, তেমনি তাদের আলাপেরও ছিলো না বিশেষ কোনো ভাষা। শুধু প্রবহমান অনর্গলতা দিয়ে তৈরি।

কিন্তু ইদানি তাদের এই আলাপটা সর্বাণী কেমন পছন্দ করছেন না। চোখের কোণায় চাউনিটা কেমন তার তেরছা হয়ে এসেছে।

বীথির মুখে তার সেই অনাবৃত হাসি তার আজকাল ভালো লাগে না, ভালো লাগে না উনুনের পাশে বেড়ালের মতো গা ঘেষে সুধীনের এই ঘনিয়ে বসা। বসবার ভঙ্গিটাও আজকাল বীথি শুধরে নিতে শেখেনি, আগের মতো তেমনি কেমন অগোছাল, তেমনি কেমন অন্যমনা: আঁচলটা নয় সম্বৃত, চুলগুলি রয়েছে বুকে-পিঠে ছত্রখান হয়ে। বয়েসের সীমায় আজও যেন সে পরিমিত হয়ে উঠতে পারেনি, শরীর সম্বন্ধে এখনো আসেনি তার বিন্দুমাত্র সতর্কতা। আর, দেখতে-দেখতে, কয়েক দিনের মধ্যেই সুধীন কেমন অবিশ্বাস্য বড়ো হয়ে উঠেছে! মেয়েদের এই বয়েসটাই বিপজ্জনক, সর্বাণী রীতিমতো বিপদের গন্ধ শুঁকলেন চারদিকে।

'কি কেবল রাত-দিন বসে ওর সঙ্গে হ্যা-হ্যা করিস ?' বীথিকে একলা পেয়ে সর্বাণী একদিন শাসনে ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

এটা তাঁর নিজের এলাকা। এখানে অন্তত বিনায়কবাবুর কাছে আপিল চলবে না।

সুবীন বাড়ি চলে গেলেও বীথির হাসির আভাগুলি তখনো একেবারে মিলিয়ে যায়নি গা থেকে। সেগুলি সে এবার শব্দের রেখায় স্পষ্ট করে তুললো, 'ভীষণ হাসির গল্প যে, মা। এক তোৎলা ছাত্র ছিলো, তার জন্যে তার বাপ উঁচু মাহিনেতে এক মাস্টার রেখে দিলেন, যে দুমাসে তার তোৎলামি সারিয়ে দিতে পারবে। মাস্টার রেখে দিয়ে বাপ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন কাশী, তীর্থ করতে। দুমাস পরে ফিরে এলেন ছেলের খবর নিতে, মাস্টারির ফল কেমন দাঁড়ালো। ও হরি, তুমি সে-কথা ভাবতেও পারবে না, মা, কি ভীষণ কাণ্ড—দুমাস সমানে মাস্টারি করতে গিয়ে মাস্টার নিজেই বদ্ধ তোৎলা হয়ে গেছে।' হাসির ঘায়ে বীথি একেবারে কাচের বাসনের মতো টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

'তাই বলে তুই এমন গলা ফাটিয়ে হো হো করে হাসবি ?' সর্বাণী রুক্ষ চোখে বললেন, 'তোর এখন বয়েস হয়েছে না ?'

'বয়েস হয়েছে কি, মা ? বয়েস হয়েছে বলে হাসির গল্প শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠতে পারবো না ?' ঝকঝকে দাঁতে বীথি আবার হেসে উঠলো। 'মেয়েছেলের সব কিছুতেই একটা শ্রী থাকা চাই,' মহান মাতৃত্বের দাবিতে সর্বাণী সমস্ত শরীরে গম্ভীর হয়ে দাঁড়ালেন, 'তাই বলে পুরুষমানুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করে হেসে গড়িয়ে পড়তে হবে নাকি ?'

'পুরুষমানুষ ?' বীথি চমকে উঠলো, 'এখানে আবার তুমি কা'কে পুরুষমানুষ দেখলে ?'

'আহা, আমার সঙ্গে আর তোর ন্যাকামো করতে হবে না, খুকি। এখানে কে তবে এতোক্ষণ তোর সঙ্গে গল্প করে গেলো ?'

'কে আবার গল্প করে গেলো ?'

'এখনো হয়তো সুধীন বাড়ি গিয়ে পৌছোয়নি, ডেকে নিয়ে আসবো নাকি তাকে ? কে আবার গল্প করে গেলো।' সর্বাণী ভুরু শানিয়ে বললেন, 'আমার চোখে তুই ধুলো দিতে পারবি নাকি ভেবেছিস ?'

বীথির কপালে আরো একটা গলা-ফাটানো হাসি লেখা ছিলো। বললে, 'তুমি এ-সব কি বলছ, মা ? ও যে সুধীন-দা।'

'আহা, সুধীন দা বলেই চিরকাল সে একেবারে দুগ্ধপোষ্য একটি খোকা আর-কি !' সর্বাণীর কথাটা বীথির মুখের উপর বিষাক্ত একটা ছোবল মারলে, 'খবরদার, তার সঙ্গে আর অমন হাসাহাসি করতে পারবিনে। দিন দিন তুই বড়ো হচ্ছিস না, বুড়ো মেয়ে ? কি, আমাকে বল্, বলতেই হবে আমাকে,' সর্বাণী ঝল্সে উঠলেন, 'তোর সঙ্গে তার কি এতো কথা থাকতে পারে ? সময় নেই, অসময় নেই, কেবল গুজগাজ, ফুটুর-ফাটুর —কিসের, কিসের এতো তোদের ঠাট্টা-মস্করা জিগগেস করি ?'

নিমেষে বীথির নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেলো। মা'র কথাগুলি ক্লেদাক্ত কতোগুলি কীটের মতো তার গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলো। কিছু যেন সে ধরতে-ছুঁতে পেলো না।

তবু সে স্তম্ভিতের মতো পাথুরে গলায় বললে, 'সুধীন-দা, সুধীন-দাকে নিয়ে তুমি এ-সব কি বলছ ?'

'ঢঙের কথা আর বলতে হবে না আমাকে। সুধীন দা, এতো বড়ো বয়েসেও সুধীন-দা।' সর্বাণী আবার একটা বিকৃত মুখ করলেন, 'যে-ই হোক সে, তার সঙ্গে খবরদার তুই মিশতে পারবিনে বলে রাখছি। তুই এখন বড়ো হয়েছিস না ? নিজের দিকে কোনোদিন একটিবার দেখিসনি

তাকিয়ে? আমাদের সময়ে এমন সব কেলেঙ্কারি ছিলো না—লাজলজ্জা কি মেয়েদের একেবারে উঠেই গেলো সমাজ থেকে? আমাদের সময়ে—' লজ্জায় ও অপমানে বীথি একেবারে শুকিয়ে শাদা হয়ে গেলো।

জানতো না, ইতিমধ্যে সে কখন বড়ো হয়ে উঠেছে। জানতো না, যা মাত্র একটা শারীরিক স্বাভাবিকতা, তাই এতো বড়ো একটা অন্যায়।

দুঃখে বীথির চোখে জল এসে গেলো।

মনে পড়লো সেদিনের সুধীন দার সেই কথা। সুধীন-দা বলেছিলো, কি-রকম নরম, সিল্কের মতো নরম স্বরে, 'আচ্ছা বীথি, তুমি আমার নামের পেছনে বিদঘুটে ঐ একটা বিশেষণ লাগাও কেন? আমিও কি এমনিতেই তোমার কাছে যথেষ্ট নই?'

বীথি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলেছিলো, 'তবে তোমাকে কি বলে ডাকবো?'

'আমার যা নাম, শুধু তাই বলো।'

'পাগল! তা আমি মরে গেলেও পারবো না। সেই কতো ছোট থাকতে তোমাকে দাদা বলে এসেছি।'

'কে তোমাকে বলতে শিখিয়েছে জিগগেস করি?'

'কেউ শেখায়নি। এটা আমাদের সমাজের চলতি একটা ভদ্রতা। প্রতিবেশিতাকে আমরা এমনি আত্মীয়তায় নিয়ে আসি।'

সুধীন উত্তেজিত হয়ে বলেছিলো, 'তার জন্যে তাকে একটা মিথ্যে বিশেষণ দিয়ে খণ্ডিত করে তুলতে হবে? তোমার কি মনে হয় না বীথি, কোনোদিন মনে হয়নি, তোমার ঐ ভদ্রতার পেছনে আমাদের কুৎসিত একটা কুসংস্কার আছে লুকিয়ে?'

বীথি জিগগেস করেছিলো, 'কি?'

'যে, পাছে আমরা কোনো অন্যায় বা অশোভন আচরণ করে বসি,

বিশেষতো মেয়েদের সম্পর্কে, তাই, সেই কুৎসিৎ সন্দেহের থেকেই আমরা এমন একেকটা বিশেষণ আরোপ করি। তুমি এরি জন্যেই আমাকে দাদা ডাকবে, কেমন!, দাদা না ডাকলে যদি আমি, বুঝলে না ?'—যদি আমি—কথাটা সে আর এক নিশ্বাসে শেষ করতে পারেনি, হাসতে গিয়ে কেমন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েছিলো।

বীথি ব্যস্ততার ভান করে বলেছিলো, 'জানি না বাপু, তোমার বিশেষণের কি বিশিষ্টতা! চুল-চেরা ওজন-করা সব মানে। যাই তুমি বলো, আমি পারবো না কিছুতেই তোমায় নাম ধরে ডাকতে, আমাকে কেটে ফেললেও নয়।'

তারা যে-ভাষায় কথা বলে আসছিলো, তার মাঝে এতোদিন কোনো ব্যাকরণ ছিলো না, ছিলো না কোনো অর্থের পারম্পর্য। মা এসে এক কথায় সব মানে ধরিয়ে দিলেন।

মা'র চোখের তাপ লেগে এক নিশ্বাসে বীথি বয়েসের তাপে ফেঁপে উঠেছে। চুলগুলি এখন থেকে তার খোঁপায় উঠেছে উদ্ধত হয়ে, আঁচলে এসেছে প্রখর পারিপাট্য। তার দুই চোখ উঠেছে কৌতূহলে আবিল হয়ে। প্রতিটি পা-ফেলায় সে এখন সশরীর সচেতন, মা'র কথা সে ফেলতে পারে না।

তাই বলে সুবীন-দার দিকে সে পিঠ করে বসে থাকে তার সাধ্য কি!

তার কিসের ভরে আর ভয়, তার তো বয়েসই হয়েছে এখন থেকে!

কিন্তু আশ্চর্য, তার সঙ্গে-সঙ্গে সুবীনও কেমন অলক্ষিতে এসেছে বুড়িয়ে। তার গাম্ভীর্যের ছোঁয়াচ লেগে সে-ও যেন কেমন গম্ভীর হয়ে উঠলো।

আগে সে কতো গল্প করতো, তার স্মৃতিমান মুখরতায় প্রখর কতো গল্প, কতো তাকে গান গাইতে বলতো, করতো কতো ছুটোছুটি,

কতো ছেলেমানষি—এখন, এই কদিন যেতে-না-যেতেই সে-ও কেমন চুপ করে গেছে। যেন বীথিরই অনুচ্চারণীয় সহানুভূতিতে। গল্প-গুজব আর যেন তার ভালো লাগে না, বীথির গানের বদলে ভালো লাগে যেন তার এই অচপল স্তব্ধতা।

মা কি তবে মিথ্যে বলেননি ?

এতোদিন সুধীনের সঙ্গে মেলামেশায় কোথাও এতোটুকু তার বাধতো না, ছিলো সে মোহানার মুখে ঢেউয়ের মতো উচ্ছ্বসিত। তার চার-পাশে শরীরের তখন কোনো ভার ছিলো না, ছিলো শুধু একটা উপস্থিতি : ছিলো না এমন একটা আবহাওয়ার ঘনতা, ছিলো কতোগুলি শুধু উড়ন্ত মুহূর্ত।

আজকাল, মা'র সেই অমূল্য তিরস্কারের পর থেকে, সুধীনের এই স্তব্ধতাটা সে যেন গাঢ় একটা স্পর্শের মতো অনুভব করছে। আজকাল সুধীন যেন তার দিকে কি-রকম করে তাকায়, তার দুই চোখের মাঝে ডেকে নিয়ে আসে তার সমস্ত আত্মা, সমস্ত আত্মীয়তা, কি রকম অস্পষ্ট করে যেন কথা কয়, তাকে আর ঠিক ধরা-ছোঁয়া যায় না, থেকে থেকে কি-রকম তার পায়ের পাতাটা সে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে।

মায়ের চোখ দিয়ে মানেটা যেন বীথি ঝাপসা ঝাপসা বুঝতে পারে। তার কেমন ভয় হয়, কথা-না-বলার বদ্ধ একটা গুমোটের মধ্যে বসে সে হাঁপিয়ে ওঠে।

সুধীন যেন তার মাঝে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, দুই চোখে তার ছুরির মতো ধারালো স্নেহ : কি যেন সে বলে উঠতে চাইছে, দুই চোখে তা বলতে না-পারার অমানুষিক যন্ত্রণা।

আশ্চর্য, তবু তার পাশটি ছেড়ে উঠে যেতে বীথির চারপাশে কোনো প্রশ্রয় নেই।

একদিন সুধীন সত্যি-সত্যিই কথাটা বলে ফেললে।

বৃষ্টি লেগে নীল হয়ে এসেছিলো চৈত্রের সেই অপরূপ সন্ধ্যাকাল। করুণ একটি লজ্জার মতো সুন্দর সেই ধূসরতা।

বীথির বাহুর কাছেকার শাড়ির পাড়টা নিয়ে খেলা করতে-করতে সুধীন গাঢ় গলায় বললে, 'জানো বীথি, সংসারে এমন একেকটা কথা আছে যা মুখে উচ্চারণ করলে তার আর কোনো মাত্রা থাকে না। তবু মানুষকে তা বলতে হয়, না বলা পর্যন্ত সে বেঁচে উঠতে পারে না—জীবনে অন্তত একবার সে এমনি বেঁচে উঠতে চায়।'

ভয়ে-ভয়ে, একটু-বা মুগ্ধের মতো বীথি বললে, 'কি কথা?'

'ঈশ্বর আছেন, এ কথা যদি কেউ তোমাকে বলে, তোমার কাছে নিশ্চয়ই কেমন খেলো শোনাবে—তেমনি ঈশ্বর নেই, এ কথা বললেও। কিন্তু দুটো কথাই দুজনের কি গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিতে পারে এ কথা হয়তো তুমি-আমি কেউ এক নিমেষে বুঝে উঠতে পারবো না। তেমনি—'

'কি কথা, বলেই ফেল না ছাই।'

'হ্যাঁ, আমি বলবো।' সুধীন হঠাৎ হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকোলো, 'কিন্তু আমার ভীষণ ভয় করছে, বীথি, আমার মুখে কথাটা না জানি কি রকম শোনাবে।'

বীথি নিস্পৃহ গলায় বললে, 'তুমি তো আর স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছ না যে কথাটা কি রকম শোনাবে বলে ভয় পাচ্ছ! মনে যা আছে, সোজাসুজি মুখে তা আওড়ে গেলেই তো চুকে যায়।'

'জানো বীথি,' যেন সন্ধ্যার আকাশের প্রথম তারাটির মতো কতো দূর থেকে সুধীনের স্বর শোনা গেলো, 'জানো বীথি, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি—'

জানলার বাইরে অন্ধকারে বীথি যেন তার মা'র মুখ দেখতে পেলো।

'সোজাসুজি বলতে গেলে কি বাজে, কি বিশ্রীই যে শোনায়,' কতোক্ষণ পরে মুখ তুলে বীথির মুখের দিকে চাইতে গিয়ে সুবীন দেখতে পেলো সে-মুখ কখন এই সন্ধ্যার মতোই নিবে গেছে, 'যেমন অক্ষর গুনে-গুনে কবিতা মেলাতে হয়। তবু কথা—কথাই সমস্ত কবিতা নয়—কথা মানুষের একটা শাস্তি, একটা বোঝা।'

সেই মা'র মুখ আস্তে-আস্তে বীথির মুখের মধ্যে এসে বসে গেলো। একরকম প্রজাপতি আছে যারা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে গাছের মরা পাতার অনুকরণে নিজেদের এক নিমেষে শুকিয়ে আনে। ঝোপের মাঝে গা ঢাকা দেবার সময় ক্যামিলিয়ন যেমন রঙ বদলায়। তেমনি সেই বীথিকে কোথাও যেন খুঁজে পাওয়া গেলো না। শামুকের মতো এক নিমেষে সে কেমন সন্তর্পণে তার খোলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—দুর্ভেদ্য বয়েসের খোলে।

বিশীর্ণ, একটু বা বিস্বাদ গলায় সে বললে, 'তুমি তো আমাকে খুবই ভালোবাসো।'

'না, না, খুব নয়, মোটেই খুব নয়,' সুবীন ব্যাকুল হয়ে উঠলো, 'আমার ভালোবাসার কোনো বিশেষণ নেই, বীথি, যেমন নেই আমার নামের। আমি তোমাকে ভালোবাসি, এমনি, এতোটুকুও কম বা বেশি নয়।'

'এ আবার কি নতুন কথা?' বীথি সরে বসলো।

'নতুন কথা নয়? সূর্য তো রোজই ওঠে, তবু একেকদিন ভোরবেলায় সূর্য দেখে তোমার মনে হয় না, এ একেবারে নতুন সূর্য, এমন সূর্য এর আগে আর কোনোদিন ওঠেনি পৃথিবীতে?'

'ভালোবাসো তো,' খাটের প্রান্ত থেকে বীথি তার দ্রুত, দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতায় উঠে দাঁড়ালো, 'আমাকে এখন কি করতে হবে?'

সুধীন হাত বাড়িয়ে কিছু যেন আর ধরতে পেলো না।

বীথি অল্প একটু হাসলো, তার মা যেমন করে হাসে, বললে, 'পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি পেয়ে ঠেসে কতোগুলি নভেল পড়েছ বুঝি?'

'নভেল? কিন্তু আমার এই কথা পৃথিবীর কোন উপন্যাস লিখতে পারতো বলো? এ একটা শুধু কথা নয়, ছাপার অক্ষরে তাকে ধরে রাখা যায় না, মুখের কথায় দেয়া যায় না ফুরিয়ে।' সুধীন তার দিকে ঘোলাটে, অসহায় চোখে চাইলো, 'তুমি কি কিছুই বুঝতে পারো না?'

'এই প্রথম বুঝলুম। বুঝলুম তুমি কতোদূর অধঃপাতে নেমে গেছ।' বীরের মতো বীথি দরজার দিকে অগ্রসর হলো।

দরজার দিকে অগ্রসর হলো কেননা মা তাকে ডাকছেন, ডাকছেন তাকে তাঁর বিশাল, বলিষ্ঠ আশ্রয়ে। ভেবে সে সত্যিই অবাক হয়ে গেলো, মা কেমন ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন গোড়া থেকেই। আশ্চর্য, সে কিন্তু এর একবিন্দুও বুঝতে পারেনি ঘুণাক্ষরে। তাই বলে সে হেরে যাবে মনে করেছ নাকি? মা এসে তবে সত্যি-সত্যি দেখে যান, মায়ের মুখ সে উজ্জ্বল না করেছে তো কি বলেছি!

দরজার দিকে অগ্রসর হলো, কেননা নির্ভুল সে বুঝতে পেরেছে, এর মতো আর পাপ নেই সংসারে, এর চেয়ে দুর্নীতি। বুঝতে পারলো, যেমন ধোয়া দেখে আগুন বোঝা যায়।

'ও কি, চলে যেয়ো না, বীথি। দাঁড়াও, শোনো,' সুধীনের গলায় ঘরের শূন্যতা যেন চীৎকার করে উঠলো।

বীথি দাঁড়ালো। মা যেন তাকে একটু দাঁড়িয়ে যেতে বললেন। বললেন, 'বল, শুনি।' বীথিও তাকে মনে-মনে অমনি শোনাবার জন্যে স্পষ্ট, প্রখর গলায় বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে তোমার নভেলের নেকি নায়িকাদের

মতো প্রেমালাপ কববাব আমাব সময় নেই। আমাব অনেক সঙ্কল্প। চাঁদের আলোয় গলে যাবাব জন্যে আমি জন্মাইনি।'

'তুমি জানো না তুমি কি বলছ।' সুনীন হাত বাড়িয়ে বুঝি তাকে ধবতে গেলো।

'তুমিই জানো না কা'কে তুমি কি বলছ। ফেব আমাকে তুমি এমনি অপমান কববে তো মাকে গিয়ে এক্ষুনি বলে দেবো বলে বাখছি। এ বাড়ি আসা তোমাব বন্ধ কবে দেবো।'

দবজাটা আছড়ে দিয়ে বীথি ঘব থেকে গেলো বেবিয়ে।

আকাশেব সেই আনীল অন্ধকাবে সুনীন কিছুতেই খুঁজে পেলো না, একজনকে ভালোবাসলে, তাব মতো কবে ভালোবাসলে, কি কবে সত্যি তাকে অপমান কবা হয়।

তারপরে অবিশ্যি সুবীন আর এ-বাড়ি আসেনি। তাতে তো বীথির ভারি বয়ে গেছে। সে আসে না বলে ঘড়ির কাঁটায় সময় যেন একেবারে আটকে রয়েছে আর-কি।

আশে-পাশে তার রাশি-রাশি বই, দুপুর জুড়ে তার গা-ঢালা লম্বা ঘুম, তা ছাড়া কদিন হলো শ্বশুরবাড়ি থেকে তার মেজদি এসেছে।

শাশুড়ির সঙ্গে কি-একটা তার ঝগড়া হয়েছিলো বিজাতীয়, ছেলের জন্যে ফিরিয়ালার কাছ থেকে রঙিন দু'গজ ছিট কেনা নিয়ে। শাশুড়ির বক্তব্য ছিলো এই, তার ছোট দেওরের জন্যে আজ দুমাস ধরে যখন সামান্য একটা ফতুয়া হচ্ছে না, তখন সে তার ছেলের জন্যে এতো সহজে আঙুলগুলি ফাঁক করলো কি বলে? তার সোয়ামি আজকাল এক-আধটা পয়সা কামাচ্ছে বলে তার ঘাড়ে একেবারে কেশর গজিয়েছে, না? জবাব দিতে মেজদিও কিছু কসুর করলো না, দয়া করে বিধাতা তাকেও একখানা জিভ দিয়েছিলেন, আর সে জিভ এখন দস্তুরমতো রক্তের স্বাদ পেয়েছে। আর, শাশুড়িই যখন তার কোলের ছেলের জন্যে লড়তে পাচ্ছেন, তখন সে-ই বা কেন ছেড়ে কথা কইবে—সে-ও এখন থেকে শাশুড়িদের দিকেই পা বাড়িয়েছে। গড়াতে গড়াতে ঝগড়াটা এসে এমন জায়গায় দাঁড়ালো যে স্বর্গ থেকে স্বয়ং নারদ পর্যন্ত জিভ কাটলেন। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে শাশুড়ির ছেলের আবির্ভাব হলো, এবং বলা বাহুল্য, মা'র অপমান সে সহ্য করতে পারলো না। আর মেয়েমানুষের মতো অকারণ বাক্যব্যয় করে সে তার আয়ুক্ষয় করতে রাজি নয়, দস্তুরমতো হাত-পা

ছুঁড়ে শারীরিক ব্যায়াম করবার সে পক্ষপাতী। চুলের ঝুঁটিটা ঠিক ধরবে কিনা জানা নেই, রাত্রের ট্রেনেই মেজদিকে নিয়ে তার শাশুড়ির ছেলে রওনা হলো স্ত্রীকে সরাসরি তার বাপের বাড়িতে রেখে দিয়ে আসতে। এবং গাড়ি থেকে তাকে নামিয়ে দিয়েই চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে কোথায় যে সে উধাও হলো তার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না।

বিবরণ শুনে সর্বাণী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, 'কি সর্বনাশ! তাই বলে তুই এমনি ডুঙ্গা মেরে চলে আসতে গেলি কেন? কেন তুই দরজার চৌকাঠ ধরে বসে রইলি না?'

মেজদি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, 'আমি কি করবো, মা? আমি চলে এলুম কোথায়? আমাকে দিয়ে গেলো—জোর করে আমাকে দিয়ে গেলে আমি কি করতে পারি?'

'দিয়ে গেলো,' বীথি সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো, রাগে লাল হয়ে বললে, 'তোমার লজ্জা করা উচিত, মেজদি। আমি হলে কতো আগেই নিজে থেকে চলে আসতুম, জোর করে চলে আসতুম। কেউ দিয়ে যাবে বলে বসে থাকতুম না।'

এই বিপদের মাঝে সর্বাণী ছোট মেয়ের কথার রসগ্রহণ করতে পারলেন না। আগের স্বরের রেশ টেনে বললেন, 'এখন কি উপায় হবে? যদি তারা এখন ছেলেকে ধরে অন্য জায়গায় বিয়ে দেয়?'

মেজদি ঠোঁট উল্টিয়ে বললে, 'ইস?'

'ইস্ কি? যদি বিয়ে দেয়, তুই কি করতে পারিস?'

'বিয়ে দিলেই হলো আর কি। তাদের ছেলে আমি পেটে ধরিনি?' মেজদি নিশ্চিন্ত মুখে হাসবার চেষ্টা করলো। সর্বাণী কথাটা উড়িয়ে দিলেন, 'বয়ে গেছে তাদের ছেলে নিয়ে। পুরুষমানুষের আবার ছেলের ভাবনা।'

দিক না বিয়ে।' মেজদি এবার বেড়ালের মতো ফোঁস করে উঠলো, 'পালাবার সে আর পথ পাবে ভেবেছ নাকি? আমি মামলা করতে পারবো না?'

'তোমার লজ্জা করা উচিত, মেজদি,' বীথি ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'সামান্য ক'টা টাকার জন্যে তুমি ঐ অত্যাচারী পুরুষের কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতবে? ছি ছি ছি। কেন, কিসের তোমার দুঃখ, কিসের তোমার ভয়, ত্যাগ যদি সে তোমাকে করে, তার মানে, তুমিও তাকে ত্যাগ করলে। তার মানে, তুমিও তখন স্বাধীন, তুমিও তখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজে খেটে খাবে, তবু দাঁতে কুটো করতে পারবে না।'

মেজদি তার দিকে যেন কেমন করুণ করে চাইলো।

সত্যি, বীথি বেঁচে গেছে, বেঁচে গেছে সে তার এই বয়সের ভারমুক্ততায়। বেঁচে গেছে, কেননা সে তার পায়ের নিচে অনুভব করতে পারছে পৃথিবী, দেখতে পারছে তার পথের সূচনা। সে আর মেজদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। বেঁচে গেছে সে।

'ভয় কি, পড়তে শুরু করে দাও—আলাদা করে মেয়েদের পাশের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক সব উদার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। ক বছর বা লাগবে, প্রাইভেটে ম্যাট্রিকটা পাশ করে ফেল—তারপরে ট্রেনিংটা দিয়ে দাও চটপট। কোথায় কে আর তোমাকে বাধা দেয়?' বীথি শরীরে একটা লঘুতার পাখা মেলালে, 'তারপরে সটান মাস্টারি, মাস্টারি মেয়েদের কে আটকায়?'

তবু, এতোতেও সর্বাণী ভিজলেন না। মেজোমেয়ের হাত ধরে একটা হতাশাসূচক টান মেরে ভাঙা গলায় বললেন, 'কিন্তু তুই ঠাট করে চলে আসতে গেলি কেন? স্ত্রীর গায়ে স্বামী অমন এক-আধটু হাত তুলেই থাকে সময় সময়, তারি জন্যে তুই তোর মাটি ছাড়লি কি বলে? শুধু

ক'টা পয়সা পেয়ে তোর কি হবে, বোকা মেয়ে?' সর্বাণী হাপুস চোখে কেঁদে উঠলেন।

মেজদির কিছু বলবার আগেই বীথি উঠলো ঝাঁজিয়ে, 'তুমি দেখছি একেবারে গীতা আওড়াচ্ছ, মা। স্বামী দিব্যি হাতের সুখ করে নেবে, আর আমরা ভাতের সুখের জন্যে মাটি কামড়ে পরে থাকবো? পয়সা—পয়সার জন্যেই তো তোমাদের যতো ভাবনা। যার পয়সা আছে, তার পাপের পর্যন্ত ক্ষমা আছে। ভয় নেই, লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারলে মেজদিরও এই পয়সার জন্যে ভাবতে হবে না।'

মেজদিকেও দেখা গেলো বীথির কথা উপেক্ষা করে মা'র কথারই জবাব দিতে। ঠোঁটের কোণে গূঢ় একটি হাসি লুকিয়ে রেখে সে হালকা গলায় বললে, 'মিছিমিছি তুমি ভয় কবছ, মা। আমাকে ফেলে সে কোথায় যাবে?'

বীথি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'গেলোই বা। তুমি অমনি ল্যাজ নামিয়ে কুকুরের মতো তার পিছু-পিছু ছুটবে নাকি?'

মেজদি বাঁকা চোখে হাসলো, বললে, 'সে-ই আসবে দেখিস।'

সর্বাণী বললেন, 'আসবেই যদি, তবে অমন একটা লাফ মেবে চলে গেলো কেন?'

মেজদি ঠাট্টা করে বললে, 'বীর যে। কিন্তু আমি জানি না মোল্লার কদ্দুর দৌড়? যাবা সসন্তান স্ত্রীকে ত্যাগ করে মা, জানো, সেই ছেলে যদি মানুষ হয়, বা যখন তার বিয়েব বয়েস ঘনিয়ে আসে, তক্ষুনি তারা এসে আবার তাদের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সঙ্গে ভাব জমায়।'

বীথি রুখে উঠলো, 'তুমি তবে তোমাব ছেলেব মানুষ হওয়া অবধি কাব্যের শকুন্তলার মতো অপেক্ষা করবে নাকি?'

'তার দরকাব হবে না। তার আগেই, ছেলের মানুষ হবার আগেই, তার

পিতৃদেব মানুষ হয়ে উঠবেন আশা করি।' মেজদি সারা শরীরে গর্বসূচক একটা ভঙ্গি করলে।
বীথি অবিশ্যি আর কিছু আশা করতে পারলো না। নিষ্ফল রাগে সে অসহায় বোধ করতে লাগলো।
'জামাইকে তবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একখানা বড়ো করে চিঠি লিখে দে,' সর্বাণী গলাটা একেবারে রসে ডুবিয়ে আনলেন, 'আমিও ক্ষমা চেয়ে তোর শাশুড়িকে লিখে পাঠাই। কি কপাল, একবেলা সে খেয়ে পর্যন্ত গেলো না। খুকির রেজাল্টটা এই শিগগির বেরুবে, তেমন কিছু ভালো হলে ভেবেছিলুম একটা ভোজ দেবো, ততোদিন—'
একটা ঘাই মেরে ঘর থেকে বীথি চলে গেলো।
মেজদির পতিপ্রাণতাটা মহাভারতে স্থান পাওয়ার মতো। সেই রাতেই, সেই রাত থেকেই, সে রাত জেগে-জেগে তার বীরবর স্বামীকে চিঠি লিখছে। আর কি-জানি সেই অগণন চিঠি! একটার উত্তর আসে না, তাতে মেজদির দৃকপাত নেই, অমনি আরেকটা তার তৈরি। আগেরটা যদি এক পৃষ্ঠা, পরেরটা এক তা। আগেরটা যদি এক তা, পরেরটা এক দিস্তে।
'হ্যাঁ রে, বীথি, জোচ্ছনায় কোন জ বলতে পারিস?' মেজদি এসে একদিন জিগগেস করলে।
বীথি অবাক হয়ে বললে, 'কেন, জ্যোৎস্না দিয়ে তুমি আবার কি করবে?'
'আজকাল কেমন সুন্দর জ্যোছনা উঠছে না?'
'সেই কথা তুমি জামাইবাবুকে লিখতে বসেছ নাকি?' বীথি গম্ভীর হয়ে বললে, 'অন্তঃস্থ য-য়এ ব-ফলা ওকার, চ-ছএ ন-ফলা আ।'
আরেকদিন মেজদি একেবারে একটা শ্লেট-পেনসিল নিয়ে হাজির, 'শ্লেষ্মা কথাটা কি করে লিখতে হয়, আমাকে একটু শিখিয়ে দে দিকি?'

বীথি চমকে উঠবার ভান করলো, 'ও বাবা, সে আবার কি ভয়ানক কথা।'

'কেন, খোকার যে শ্লেষ্মা হয়েছে কদিন থেকে।'

'তোমার পায়ে পড়ি, মেজদি, কফ লেখো—ক আর ফ, আপদ চুকে যাক।' বীথি হাত দিয়ে শ্লেটটা ঠেলে দিলো।

'আহা, কতোই যেন বিদ্যানী হয়েছিস! নিজেদের বেলায় এ-সব দরকারি কথা তো আর লিখবি না, লিখবি যতো কাকের ঠ্যাং আর বকের মাথা! জানি না, জানি না তোদের কীর্তি?' মেজদির চোখ দুটো ঘৃণায় কিলবিল করে উঠলো।

সত্যি কথা বলতে কি, লজ্জা করতে লাগলো বীথিরই সব চেয়ে বেশি, অপমানে সে-ই শুধু এলো শীর্ণ হয়ে। মেজদির এই ব্যবহারে যে বিশেষ কিছুই গৌরব করবার নেই এ-কথা তাকে কে বোঝাবে? নেপথ্য থেকে সমস্ত সংসার তাকে উৎসাহিত করছে, দেশ থেকে পোস্টআপিস যে উঠে যায়নি এই যেন তার যথেষ্ট গৌরব। আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে বীথির গা গুলোতে লাগলো। যে একদিন নির্বিবাদে ঘাড় থেকে ফেলে দিতে পারলো স্বচ্ছন্দে, আবার তারই কাঁধে ওঠবার জন্যে পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দেয়াটা বীথি সহ্য করতে পারলো না। মেজদির এতোই যখন ভরসা ছিলো নিজের উপর, তার শারীরনিষ্ঠ সতীত্বের উপর, তবে সে চুপ করে থেকে সেই জোর খাটাতে গেলো না কেন? কেন গেলো সে ফের হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিতে? লাথি মারতে গিয়ে পতিদেবতার যে-পায়ে চোট লেগেছে, সে পায়ে সে আঁচল ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বসলো! কেন এই দীনতা, মরতে বসে কেন আর এই গঙ্গাজল চাওয়া? অথচ মেজদির এতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যে বাংলা ভাষা নিয়ে সাহসী একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে পারছে, তাতেই

সে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখা মেলে, তাতেই তার আর মাটিতে পা পড়ছে না।
কেবল সে-ই পদ্য লিখতে পারে বলে বীথি মনে করেছে নাকি ?
সব দেখে শুনে বীথি রাগে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। পাড়ের কাছে ঘোলা জল আর না ঘেঁটে সে চুপ করে গা ভাসিয়ে দিলে তার মধ্যসমুদ্রের মৌনে, যেখানে উন্মত্ত ঢেউ নেই, সফেন কোলাহল নেই, যেখানে তার স্বপ্নের মতো প্রসারিত একটি শান্তি, অতলায়িত একটি গভীরতা। যেখানে কে যে আকাশ, কে যে সমুদ্র, কিছুই আলাদা করে চেনা যায় না—অস্তিত্বের সেই একটা বিরাট সম্মোহনে।
কিন্তু, আ মরি, বাংলা ভাষা ! তার প্রকাশক্ষমতা কি পরিমাণ বেড়ে গেছে ভাবতে বীথি স্তম্ভিত হয়ে গেলো। মাটির কলসী রেখে-রেখে ঘাটের পাথরই নাকি একদিন ক্ষয় হয়ে গিয়েছিলো—স্কুলে 'অধ্যবসায়' নিয়ে রচনা লিখতে গিয়ে বোপদেবের এ উদাহরণটা সে কতোবার লিপিবদ্ধ করেছে —আর এ তো সামান্য পুরুষের মন ! শেষকালে জামাইবাবুর একখানা চিঠি এসে উপস্থিত !
'কি লো, আর নাকি চিঠি লিখবে না বলেছিলি ?' আহ্লাদে মেজদি একেবারে চারপাশে আছাড় খেয়ে পড়ছে, 'এই ত্যাখ্।'
আঙুলে করে রঙিন একটা খাম নিয়ে হাওয়ায় সে ফরফর করতে লেগেছে।
পিছলাতে-পিছলাতে সর্বাণীও ছুটে এলেন, 'জামাই চিঠি লিখেছে নাকি ? কি লিখেছে ? ভালো আছে তো ?'
বিজ্ঞ ভাব করে মেজদি বললে, 'ভালো থাকবে না তো যাবে কোথায় ?'
'যাক,' সর্বাণী ছেঁড়া এক টুকরো কাগজের মতো হালকা হয়ে গেলেন, 'যাক, ভাবনা ঘুচলো। এখানে আসবে বলে কিছু লিখেছে নাকি ?'

'দাঁড়াও, ব্যস্ত কি! না এসে সে যাবে কোথায়?' মেজদি টলতে-টলতে বেরিয়ে গেলো।

এর পর থেকে মেজদিকে আর পায় কে। সে ফের খুঁজে পেয়েছে তার নিজের জায়গা, তার নিজের জগৎ। এতোদিন পর্যন্ত তবু-বা তার একটা ধরা-পড়া অপরাধীর চেহারা ছিলো, এখন থেকে সে একেবারে উড়াল দিয়ে চলেছে। নিজের মাঝে নিজে সে আর আঁটছে না স্ফূর্তিতে উঠেছে ফেনিয়ে। মিছিমিছি বাবা-মা এতো ব্যস্ত হয়েছিলেন, সে জানে না তার আঙুলে কি কৌশল খেলে, সে জানে না তার নিজের মূল্য। চলায়-বলায় মেজদির সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ যেন পিছলে পড়তে লাগলো। তাকে আর ছোঁয় কারুর সাধ্য কি!

এ ক'টা দিন বীথির কাছাকাছিতে সে কেমন নিস্তেজ ছিলো, আর ভয় নেই, হাতে পেয়েছে সে এখন রঙের টেক্কা, তার সংসারের খেলায় নিশ্চিত একটা পিট। এখন বীথি আর তার গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়, নিতান্তই একটা আনাড়ি খুকি, মেজদির এই চিঠি পাওয়ার পর থেকে—তার সঙ্গে মেজদি এখন মিশতে পর্যন্ত পারে না। আগে যদি বা লুকিয়ে একটু শ্রদ্ধা করতো, এখন দস্তুরমতো মুখের উপর সে শাসন করতে লাগলো। খাঁচার নিরীহ সেই পাখিটা এখন ছাড়া পেয়ে প্রবল ডানায় এখানে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, একে-ওকে নখ বসিয়ে দিচ্ছে। মিড়মিড়ে সেই শিখাটা বিস্ফারিত হয়ে পড়লো নির্লজ্জ দাবানলে। বীথি লজ্জায় ক্লান্ত হয়ে উঠলো —এমন একটা অশ্লীল ছবি সে আর দেখতে পারছে না চোখ মেলে।

শুয়ে-শুয়ে বীথি একটা কি বই পড়ছিলো। শিয়রের দিক থেকে মেজদি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলে, 'কি পড়ছিস রে ওটা?'

বইটা আঙুলের ফাঁকে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেলে বীথি বললে, 'ও আছে একটা। তুমি বুঝবে না।'

বুঝবো না মানে ? স্পষ্ট বাংলা অক্ষর দেখতে পেলুম স্বচক্ষে। বাংলা বই আমি বুঝতে পারবো না বলিস ? তোর এতো দেমাক ?'

'অক্ষর চিনলেই লোকে বুঝতে পারে নাকি ?'

'কি পড়ছিস তাই বল্ না।' টান মেরে বইটা মেজদি ছিনিয়ে নিতে গেলো, 'নভেল বুঝি ?'

জামাইবাবুর চিঠি পাবার পর থেকে মেজদি কখন বোন থেকে দিদিতে গদিয়ান হয়েছে। সন্দিগ্ধ চোখে বীথিকে দিচ্ছে পাহারা। পান থেকে কোথায় তার চুন খসলো, তার বসাটা কোথায় ঠিক হচ্ছে না, তার শোয়া কেমন বিচ্ছিরি, ঘাড়-গলা ঢেকে কেমন সে আঁচল রাখতে পারে না সব সময়, গলা ছেড়ে কেমন নিলজ্জের মতো হাসে, খেয়ে উঠে পিঁড়িটা কেমন দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখতে ভুলে যায়—এ-মেয়ের উপায় হবে কি, মা ? শ্বশুর-বাড়িতে যে ও দুদিনও টিকতে পারবে না। সোয়ামি যে লাথিয়ে বাড়ির বার করে দেবে। খালি পাশ করলেই কি হয়, মেয়েছেলের যে সৌষ্ঠব শেখা দরকার। ইদানি মেজদি তাই লেগেছিলো তাকে প্রতি পদে সৌষ্ঠব শেখাতে।

তারপর বিয়ে না হতে চোখের সামনে কিনা জলজ্যান্ত সে উপন্যাস পড়ছে। এর চেয়ে কদর্যতর চরিত্রহীনতা মেজদি আর কি কল্পনা করতে পারতো ?

'দেখালি না কি বই ? দাঁড়া, মাকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আসি।'

'কি আর দেখবে।' বীথি হাসতে-হাসতে উঠে বসলো, 'যা তুমি ভেবেছ। উপন্যাস। এই দেখ।'

বইর নাম দেখে মেজদির চক্ষু একেবারে চড়কগাছ। এবারও বইটা সে কেড়ে নিতে পারলো না, অসহায় রাগে বোবা গলায় সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুই এই অল্প বয়েসে এমন একটা বিতিকিচ্ছি নভেল পড়তে বসেছিস ?'

বীথি হেসে বললে, 'এতোদিন তো তোমার চোখে আমি একটা ধিঙ্গি, ধাড়ি, আরো কতো-কি ছিলুম, আমার বয়েসের কোনো গাছ-পাথর ছিলো না, আজকে হঠাৎ একেবারে বয়েসটা আমার এক ধাক্কায় এতো নেমে গেলো, মেজদি ? বলো কি অদ্ভুত কথা !'

গোলমাল শুনে সর্বাণী এ-ঘরে এসে হাজির হলেন। বীথি সম্বন্ধে সব সময়েই তিনি উদ্বিগ্ন, বীথির কথা ভেবে তিনি কাঁটার উপর হাঁটছেন, মেজোমেয়ের নির্ভুল চোখে আবার তার কি খুঁত ধরা পড়লো জানবার জন্যে তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, 'কি হলো ?'

'কি সর্বনাশের কথা, মা,' মেজদির চোখ দুটো তখনো প্রকৃতিস্থ হয়নি, বললে, 'বীথিটা শুয়ে-শুয়ে দিব্যি একটা নভেল পড়ছে।'

'কি নভেল ?' সর্বাণী ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন, 'বটতলার নাকি ?'

'তার চেয়েও জঘন্য, মা। মা'র সঙ্গে বসে কোনো ছেলেমেয়ে একত্র পড়তে পারে না।'

বীথি ঝল্‌সে উঠলো, 'আমি মা'র সঙ্গে বসে পড়ছিলুম নাকি ? আর মা'র সঙ্গে বসে তুমি কি পড়তে পারো, বাল্মীকির রামায়ণ পড়তে পারো, না ব্যাসের মহাভারত পড়তে পারো ? তোমার সাহিত্যচর্চাগুলিই বা কতোটা মা'র সঙ্গে হয় জিগগেস করি ?'

এ-সবের উত্তর দেবার জন্যে মা বা মেজদি কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। শঙ্কাকুল চোখে সর্বাণী বললেন, 'কি নিয়ে লেখা ? তুই পড়েছিস বইটা ?'

'পড়িনি ? বছর দুই আগে আমার একবার সেই পান-বসন্ত হয়েছিলো না, মা ?' মেজদি বলতে লাগলো, 'পাড়ার লাইব্রেরি থেকে তখন বই আনিয়ে পড়তুম। এ বইটা তেমনি একদিন হাতে এসে পড়েছিলো— তোমায় বলবো কি, মা, বলতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, ছাপার অক্ষরে

কেউ তা লিখতে পারে চোখে না দেখলে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না।' সর্বাণী বিবর্ণ হয়ে গেলেন, 'এতোদূর?'

মেজদি অবিশ্যি থামলো না, 'রোগা স্বামী ফেলে মেয়েটা নিচে এসে কাকে জানি লুচি ভেজে খাওয়াচ্ছে, আর বলছে কি না তাকে বিয়ে করবো। সেই লোকটা যেই রাজি না হয়ে চলে গেলো বেরিয়ে, মেয়েটা অমনি তার ছোট ভাইটাকে নিয়ে রেঙ্গুনে ভেসে পড়লো। আর তোমায় বলবো কি মা, বলতে আমারই মাথা কাটা যাচ্ছে, জাহাজে তারা কি কেলেঙ্কারিটাই না করলে! ছি-ছি-ছি, বইয়ের নামটাও যেমনি, তেমনি তার লেখা।'

বীথি বললে, 'আমি এখনো ঐ জায়গাটায় এসে পৌঁছুইনি।'

'তার আগেই বা কিছু কম আছে নাকি? মেসের একটা ঝি নিয়ে বাবুদের কম রঙ্গরস আছে? তুমি যদি শোনো, মা—'

তাকে বাধা দিয়ে বীথি শান্ত গলায় বললে, 'সমস্ত বইয়ে টুকরো-টুকরো করে ওগুলোই তুমি মনে রেখেছ নাকি, মেজদি? আর কিছুই তুমি দেখতে পেলে না?'

'আর দেখতে হবে না,' সর্বাণী ধমকে উঠলেন, 'রেখে দে তুই ও-বই।'

'কেন, মেজদি পড়তে পারলে আমি পারবো না কেন?' বীথির সমস্ত রক্ত ফুটতে লাগলো।

'মেজদি তো তোর চেয়ে বড়ো।'

'কোথায় বড়ো? দু বছর আগে যখন ও বই পড়েছে, তখন তো ওর আমার বয়েস।'

'মেজদির বিয়ে হয়েছে না? মেজদির কি ভয়।'

'বা রে, আমার বিয়ে হয়নি বলে আমি বই পড়তে পারবো না? কোনোদিন যদি বিয়ে না করি, তবে কোনো-একখানা বইও নয়?

বা রে, পড়তে পারবো বলেই তো আমার বিয়ে দিচ্ছ না।' বীথি হাসবে না কাঁদবে কিছু ঠাহর করতে পারলো না।

মেজদি মুখিয়ে এলো, 'সে সব তো পড়ার-বই, পাঠ্য পুস্তক।'

'আর এ বইটা দিয়ে উনুন ধরাতে হবে বলেই বুঝি এটার এতোগুলি সংস্করণ হয়েছে।' কথায় জোর পাবার জন্যে বীথি উঠে দাঁড়ালো, 'বরং তোমারই তো বেশি ভয়, মেজদি। যে-মেয়েটা লুচি ভেজে খাওয়াচ্ছিলো বলছিলে, তার স্বামী ছিলো বেঁচে, আর যে ঝি-র কথায় তোমার নাকটা ইস্ক্রুপের মতো পেঁচিয়ে উঠেছিলো, সেও এমন কিছু আর অবিবাহিত ছিলো না।'

এমন সময় বিনায়কবাবু এসে এ ব্যাপারে নাক ঢোকালেন। মেজদি সবিস্তারে আরজিটা তাঁর কাছে পেশ করলো।

যাক, এটা শুধু একলা মা'র ও মেজদির এলেকা নয়। এখানে বাবার একটা বক্তব্য আছে। আর সেটাই হবে সব চেয়ে সারবান।

বিনায়কবাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন, পরে বললেন, 'না, হ্যা, পড়বে বৈকি। পড়ে কেউ কোনোদিন খারাপ হয় না সংসারে। যারা সত্যি-সত্যি খারাপ হয়, তারা কেউ কোনোদিন এ সব বই পড়ে না, আর যদি পড়েও, তবে তা না পড়লেও তারা খারাপ হতো। সেটা কোনো কাজের কথা নয়।' কাজের কথাটা বলবার জন্যে তিনি বীথির দিকে এগিয়ে এলেন।

বীথির গলা খুশিতে তরল হয়ে এলো, 'আমিও সেই কথাই বলছিলুম, বাবা। সংসারে ভালো বইর সংখ্যাই তো বেশি, মেজদির কথায় পাঠ্য পুস্তকেরই তো এখানে ছড়াছড়ি, কতো ধর্মশাস্ত্র, কতো সদুপদেশ, কতো কি হাতি-ঘোড়া। একমাত্র বই পড়েই মানুষে যদি ইনফ্লুএন্সড হতো বাবা, তবে আজকে আমরা পৃথিবীর অন্য রকম চেহারা দেখতে পেতুম।

পৃথিবীটা বিরাট একটা ইউটোপিয়া হয়ে যেতো। গেলো মহাযুদ্ধটা অন্তত তা হলে বাধতো না। বই পড়ে ইনফ্লুএন্সড যদি কেউ হয়ও, তবে নতুন করে আরেকটা বই লেখবার জন্যে, জীবনে সেটাকে অনুকরণ করবার জন্যে নয়। কেননা কি আমার সাধ্য, তুমি নিজে না হয়ে, অন্যকে, বইর একটা চরিত্রকে অনুকরণ করতে পারো ?'

'হ্যাঁ, আমিও তো সেই কথাই বলছিলুম, বীথি, লিখতে হবে।' বিনায়কবাবু মেয়ের মুখে ইংরিজি উচ্চাবণ শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন, 'কিন্তু তুমি উপন্যাস পড়বে কেন ?'

দুই হাতের মধ্যে বইটা শক্ত কবে চেপে ধরে বীথি স্তম্ভিতের মতো চেয়ে রইলো।

'উপন্যাস তো তোমার লাইন নয়, তোমার লাইন কবিতা, তুমি কেবল কবিতা পড়বে। হ্যাঁ, মাইকেল পড়ো, কঠিন-কঠিন শব্দ শিখতে পারবে, পড়ো পলাশীর যুদ্ধ। ও-সব জোলো উপন্যাস পড়ে তোমার কি হবে ? আর রচনার জন্যে স্টাইল যদি শিখতে চাও, পড়ো কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ও-সব বাংলা উপন্যাসে আছে কি ? না মানে ব্যাকরণ, না মানে বানান, বেখে দাও সরিয়ে। ডায়লগে ইনভারটেড কমা পর্যন্ত দেয় না।'

আস্তে হাত বাড়িয়ে বইটা মেজদিব হাতে পৌঁছে দিয়ে বীথি ঘর থেকে প্রস্থান করলে।

তারপরে একদিন ম্যাট্রিকের ফল বেরুলো। গত মহাযুদ্ধের পর এমন কাণ্ড আর ঘটেনি—শুধু ই-ছাড়া আর পাঁচটা বিষয়েই বীথি লেটার পেয়েছে। ছোট্ট একটি তারকা বসেছে তার নামের পাশে।

শুধু তাই নয়, মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়ে পেয়েছে সে কুড়ি টাকার বৃত্তি। সেণ্ট জোন্‌এর যুদ্ধাভিযানের চেয়ে মহিমাময়।

এর পরে বীথি আর থামতে পারে না। কলকাতা তাকে ডাক দিয়েছে।

বীথির ইচ্ছা ছিলো কোনো হস্টেলে থেকেই সে পড়ে—অন্তত তার চারপাশে খোলা একটু বাতাস খেলুক। কিন্তু বিনায়কবাবু কিছুতেই রাজী হলেন না, বিডন-স্ট্রিট অঞ্চলে বীথির কে-এক বৈমাত্রেয় মামা আছেন বর্তমান, থাকতে হবে তার বাড়িতে, তাঁরই পারিবারিক তত্ত্বাবধানে।

বীথি মুখ ভার করে বললে, 'কিন্তু আমি কি আমার নিজের ভার নিতে পারতুম না, বাবা? আমি কি যথেষ্ট বড়ো হইনি?'

সর্বাণী ততোধিক মুখ ভার করে বললেন, 'যথেষ্ট বড়ো হয়েছিস বলেই তো ভয়। না বাপু, বিপদ ডেকে এনো না গায়ে পড়ে। একা-একা থাকা কিছুতেই চলবে না বোর্ডিঙে, এ আমি জোর গলায় বলে দিচ্ছি। ও-বাড়িতে বৌঠান আছে, বুড়ো মতন একজন অভিভাবিকা না থাকলে কি করে চলে আজকাল? সব সময়ে নজর রাখবার জন্যে হাতের কাছে একজন কড়া-ধাঁচের লোক না থাকলে আমরাই বা এখানে কি করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?'

লজ্জায় বীথি আপাদমস্তক জমে উঠলো।

'সেইটেই শেষ কথা নয়,' বিনায়কবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'কখন কি অসুখ-বিসুখ হতে পারে, মেয়েছেলের একা থাকার কতো অসুবিধে, বুঝলে না, মাথার উপরে একজন গার্ডিয়ান থাকলে কোনো দিকে আর কিছু গোলমাল থাকে না। তা ছাড়া,' বিনায়কবাবু মেয়েকে কোলের কাছে আকর্ষণ করলেন, 'তা ছাড়া, কত খরচ বেঁচে যায় বলো দিকি? কলেজের মাইনে আর হাত-খরচ নিয়ে তোমার দশ টাকাতেই চলে যাবে, আর বাকি দশ টাকা দিয়ে তুমি সংসারের সাহায্য করতে পারবে, বীথি। বলো, এটা কি কিছু কম কথা?'

এর পরে বীথি আর কিছু উচ্চবাচ্য করতে পারে না। সামান্য মেয়ে হয়ে বাপ-মা'র সে কাজে লাগতে পারবে, এর চেয়ে বড়ো মর্যাদা তার আর কি থাকতে পারে পৃথিবীতে?

'দশ টাকায় আমাদের পনেরো দিনের বাজার খরচ চলে যাবে,' সর্বাণী ঝিলিক দিয়ে উঠলেন, 'তা ছাড়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে থাকলে সবাই তোকে চিনতে পারবে—এই তো বৌঠান তোকে কোনোদিন দেখেনি, বৃত্তি পাবার পর তোকে কাছে পাবার জন্যে কি রকম পাগল হয়ে উঠেছে! বোর্ডিঙে থাকলে কে তোকে চিনতো? কলকাতায় দাদার বাড়িতে ছুটি ছাটায় হামেসা কত লোক আসা-যাওয়া করছে, সবাই তখন তোকে দেখতে পাবে কাছে থেকে, জিগগেস করলেই জানতে পারবে ম্যাট্রিকে যে সেকেণ্ড হয়ে কুড়ি টাকার বৃত্তি পেয়েছিলো সে এ বাড়িতেই আছে, সে তুই। সেটা কি কম কথা?' সর্বাণী প্রায় ফুলে উঠলেন, 'নইলে কে তোকে চিনতো, কোন বোর্ডিঙে না কোথায় সবাইর চোখের আড়ালে পড়ে মরবি-সে।'

সেটাও ভেবে দেখা দরকার। শুধু তাকে নয়, সঙ্গে-সঙ্গে তার মা-

বাবাকেও আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিতে হবে। নইলে তাঁদেরই—ব। সংসারে চিনতো কে? বীথি ছাড়া তাঁদেবই বা আছে কি গর্ব করবার? সে শুধু তাঁদের ভাবনাই বাড়িয়ে দেয়নি, বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা, তাঁদের পারিবাবিক প্রতিষ্ঠা। এটুকুই যদি সে না করতে পারলো, তবে তো সে সেই মেয়ে হয়েই বইলো, মানুষ আর হতে পাবলো না। না, সে তার বাবা-মায়েব দুঃখ ঘুচোবে, তাঁদের জীবনে আনবে সে নতুন মূল্যবেত্তা, তাঁদের সে প্রাণীহিসেবে সার্থক কবে তুলবে।

বিনায়কবাবু বললেন, 'কি কম্বিনেশান নেবে ঠিক কবেছ? আমি বলি কি, আই-এস্-সি নাও।'

'আই-এস্-সি পড়ে কি হবে, বাবা?'

'না, কিছু হবে না, তবে,' বিনায়কবাবু একটা ঢোঁক গিললেন, 'তবে, শুনতে খুব বেশ ভালো হয় না, মা? মেয়েছেলেবা হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিখছে, এটা বেশ একটা নতুন কিছু নয়? আস্তে-আস্তে এমনি কবে তুমি এম্-এস্-সিটা পর্যন্ত পাশ কবতে পাবো—বাঙালী মেযে এ পর্যন্ত কটা এম্-এস্-সি হতে পেবেছে? সেটা একটা তবে অসাধাবণ কীর্তি হয় না?'

বীথি শুকনো গলায় বললে, 'যা শুনতে ভালো তা দিযে আমাব কি হবে? যা পডতে ভালো তাই আমাব নেযা উচিত। অসাধাবণত্ব শুধু বিষয়ে নয় বাবা, ব্যক্তিত্বে। আমি কি নয়, আমি কে।'

'তা তো ঠিকই,' বিনায়কবাবু অনায়াসে সায দিতে পারলেন, 'নিশ্চয, তোমার যে-দিকে ঝোঁক, সে-দিকেই যাওয়া উচিত একশোবার। সেই দিকে মরে গেলেও তোমাকে আমি বাধা দিতে পারবো না। আমাদেব দেশের শিক্ষায় সে-ই তো দোষ আগাগোড়া, অভিভাবকদের খেয়ালমতো

ছেলেদের হয় ভুগতে। যে হয়তো বড়ো এঞ্জিনিয়ার হতে পারতো, তাকে আমরা ধরে-বেঁধে একটা স্কুল-মাস্টার বানাই।'

খুশিতে বীথি নরম হয়ে এলো। আবদারের গলায় বললে, 'আরেকটা আরজি আছে, বাবা। আমি ভাবছি স্কটিশে পড়বো, বাড়ির কাছেই তো স্কটিশ।'

'সে কি,' বিনায়কবাবু চমকে উঠলেন, 'সেখানে তো ছেলেরা পড়ে।'

'সঙ্গে মেয়েদের পড়ারও বন্দোবস্ত আছে। ওখানে পড়তে গেলে রেজাল্ট আরো ভালো করতে পারবো, বাবা। শুধু মেয়েদের মধ্যে কম্পিট্ করতে ভালো লাগে না, একবার দেখতুম ছেলেরা কতো আর বেশি জানতে পারে আমাদের চেয়ে।'

'সে তো বেথুনে থেকেই হতে পারে,' বিনায়কবাবুর মুখ ত্বরিত কাল বোশেখির মতো ঘনিয়ে এলো, 'ও-সব বাড়াবাড়ির কোনো দরকার নেই। বুঝলে মা, কলেজটা কিছু নয়, রেজাল্ট ভালো করার পক্ষে ছাত্রই একমাত্র ইমপরট্যাণ্ট। কেন, বেথুন থেকে কি কোনো মেয়ে আর শাইন করতে পারেনি?'

তার মানে, কি পড়বে তুমি বাছতে পারো, কোথায় পড়বে তা বাছতে পারো না। স্থানদোষটা সমাজের পক্ষে একটা মস্ত বিচার। তোমার ঝোঁকটা পুরোপুরিই উপেক্ষে দেয়া যায় না—এই পর্যন্ত, ব্যস, আর নয়, বেশি দূর আর বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে কি, তুমুল একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাবে।

এ সব আলোচনায় সর্বাণী এতোক্ষণ যোগ দিতে পারছিলেন না বলে ভারি অস্বস্তি বোধ করছিলেন, এতোক্ষণে যা হোক জিভে একবার নাড়া দিতে পারলেন, বললেন, 'কি যে তুই এক একটা ঢঙের কথা বলিস, খুকি! একেবারে ছেলেদের দলে বসে পড়বার তোর কি হয়েছে! একা

কোমর বেঁধে ওদের সঙ্গেই বা তুই লড়তে যাবি কেন? ওরা তো বেশি জানবেই মেয়েদের চেয়ে।'

বীথি হেসে ফেললো, বললে, 'আমি একা নয়, মা, আরো অনেক মেয়ে পড়ছে ঐ কলেজে।'

'কি সর্বনাশের কথা! কেন, কেন,' সর্বাণী চোখে-মুখে লালায়িত হয়ে উঠলেন, 'বর পাকড়াবার মতলব বুঝি? তুই তো বিয়ে করবিনে বলে ঢেউ তুলেছিস, তোর মুখে এ আবার কি নোংরা কথা! এই বুঝি তোর বড়ো হবার নমুনা?'

যা তা।' বীথি আর টু-টি করতে পারলো না।

এর মাঝে, পরীক্ষার ফল পর্যন্ত যখন বেরিয়ে গেলো, মহেশ্বরী আবার কোত্থেকে এক পাত্র জুটিয়ে আনলেন। কোষ্ঠি-কুলজী তাঁর মুখস্থ। বর্মার জঙ্গলে না কোথায় মোটা মাইনেতে ঝকঝাক করছে।

'চামড়া বা চেহারার দিকে নজর নেই, বৌদি, শুধু লেখাপড়া-জানা মেয়ে চাই। কার যে কি রকম বায়না!' জনান্তিকে মহেশ্বরী একবার হেসে নিলেন, 'বীথিকে ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে দেখো। কলকাতাতেই তো যাচ্ছে, তোমার দাদা, ক্ষেত্রবাবুকে লিখে দাও, ওকে যেন তাদের দেখিয়ে দেন একটিবার। ছেলেও এখন ছুটিতে কলকাতাতেই আছে—হাঙ্গামা নেই।'

কথাটা বিনায়কবাবু দাঁতের ফাঁক দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, 'এমন একটা ও ভালো রেজাল্ট করলো, আর আমি জোর করে ওর কেরিয়ারটা মাটি করে দি! আমি তো বাপ নই, আমি একটা কসাই, না? জীবনের ওর সমস্ত স্বপ্ন আর সম্ভাবনা এমনি করেই অকালে নষ্ট হয়ে যাক আর কি।'

'হ্যাঁ,' কথাটা সর্বাণীরও বিশেষ মনঃপূত হয়নি, 'অমনি মাসে-মাসে কুড়িটে করে টাকা হাতছাড়া হয়ে যাক।'

'শুধু বিয়ের জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, মহেশ্বরী,' বিনায়কবাবু প্রায় গর্জে উঠলেন বলা যায়, 'পৃথিবীতে একধার থেকে সব মেয়েরই বিয়েটাই একমাত্র আইডিয়েল নয়।' রাগে তাঁর মুখ দিয়ে ইংরিজি বেরিয়ে এলো।

'আর সব মেয়ের যাই হোক গে, তার খবর কে রাখতে যাচ্ছে?' মহেশ্বরী তবুও প্রতিবাদ করবেন, 'তাই বলে বীথির তুমি বিয়ে দেবে না কেন? বন্যার মতো ওর যে বয়েস বাড়ছে দিন-দিন, তার খেয়াল রাখো?'

মহেশ্বরীকে চুপ করিয়ে দেয়া দরকার। বিনায়কবাবু রুক্ষ, একটু-বা নিষ্ঠুর গলায় বললেন, 'বিয়ের আগে মেয়েদের বয়েস যতো বাড়ে, ততোই তো ভালো। ততোদিন অন্তত তারা মনের সুখে মাছ মাংস খেয়ে নিতে পারে। বিয়ে দেবার পর দেখতে-না-দেখতে বিধবা হয়ে গেলে সব ফক্কিকার।'

কথাটা মহেশ্বরীর মর্মমূল পর্যন্ত বিদ্ধ করলো। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে যেতে যেতে তিনি ঝাপসা গলায় বললেন, 'তাই হোক, পেট ভরে বীথি মাছ মাংসই খাক চিরকাল। কিন্তু সংসারে মেয়েদের মাছ মাংস খাওয়াটাই বড়ো সুখ নয়, দাদা।'

রাত-দিন, রাত-দিন—বীথি প্রতি মুহূর্তে ক্লান্ত হয়ে উঠলো—রাত-দিন কেবল তার এই বয়েস হয়েছে। তা যেন একটা পাপ, তা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। ফোড়া হলে যেমন তাকে ফাটিয়ে ফেলতে হয়, তেমনি তার বয়েস হয়েছে বলে বিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। তার বয়েসটা যেন বসন্তের গুটির মতো তার সর্বাঙ্গে রয়েছে দৃষ্টিকটু হয়ে। উঃ, কবে সে এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারবে, কবে সে যেতে পারবে কলকাতায়, তার স্বপ্নে দেখা বিশাল সেই কলকাতায়।

তবু বাবা-মা'র কাছে এক হিসেবে সে কৃতজ্ঞ। তবু তো তাঁরা দিয়েছেন তাকে এই পড়বার স্বাধীনতা, মনে-মনে এই পাখা মেলে দেবার নভতল! তার বই-খাতাগুলি জ্বালিয়ে উমাশশীর মতো তো সে ছেলের দুধ গরম করতে বসেনি। ঘরের দেয়াল দিয়ে তাকে তো তাঁরা রুদ্ধশ্বাস শূন্যতার মাঝে পিষে ধরেননি চারপাশে, অন্তত বইয়ের পৃষ্ঠায় জানালাগুলি তো সে খুলে রাখতে পেরেছে। এই যথেষ্ট—মাটির নিচেকার ছোট একটা শিকড় থেকে এমনি করেই সে একদিন শাখায় চলে আসবে, ফলবান, সমৃদ্ধ শাখায়। সে-শাখা তখন আকাশের দিকে প্রসারিত।

তারপর এক শোকাকুল, মলিন সন্ধ্যায় বীথির কলকাতা যাবার দিন এলো।

বিনায়কবাবু তার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'খুব মন দিয়ে পোড়ো, বীথি, একেবারে গোড়া থেকেই। তোমায় কি আর বেশি বলবো, মা, তোমার এবারকার রেজাল্ট দেখে দেশে যেন একটা নাম-ডাক পড়ে যায়। বংশের তুমি মুখোজ্জ্বল কোরো। ভুলো না তুমি বড়ো হবার দায়িত্ব নিয়েছ।'

অশ্রুম্লান চোখে বীথি তার বাবার আশীর্বাদ মনে-মনে গ্রহণ করলে। প্রতিজ্ঞায় ঋজু, দৃঢ় হয়ে উঠলো তার মেরুদণ্ড।

সর্বাণী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন, 'তুই চলে যাচ্ছিস মা, ঘর দোর আমার অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু, কে জানে, ছেলেটা তো আর মানুষ হলো না, তোকে দিয়েই হয়তো আমাদের দুঃখ ঘুচবে।' তারপরে গলা আনলেন নামিয়ে, 'সব সময়ে খুব সাবধান থাকবি, যার-তার সঙ্গে মিশবি না, মামিমা যখন যা বলেন একচুল তাঁর অবাধ্য হবি না। লাজ-লজ্জা, ছিরি-ছাঁদ—বড়ো হয়েছিস, সবই তো তুই বুঝতে শিখেছিস। বেশ নরম-তরম থাকবি, এতোটুকু বেহায়াপনা যেন কেউ খুঁজে না পায়।'

বিনায়কবাবু যোগ করে দিলেন, 'এখন তোমার অধ্যয়নই হচ্ছে তপস্যা। কলেজ আর বাড়ি, বাড়ি আর কলেজ—ব্যস। লোকে যাতে ভালো বলে, তারই দিকে সব সময়ে নজর রাখবে, মা। আর মনে রাখবে, আমরা এতোদূর থেকে তোমার দিকে চেয়ে বসে থাকবো।'

ভয় নেই, বীথি কখনো দূরে থাকবে না, সব সময়ে থাকবে সে তার বাপ-মায়ের কাছাকাছি।

সংসারে এই তার অবহেলিত, গরিব বাপ-মা, নিতান্ত যাঁরা ছোট, নিতান্ত যাঁরা সাধারণ, অর্থে আর অহঙ্কারে—সে কি জানে না সেই শুধু তাঁদের একমাত্র সম্বল? সে কি জানে না তাঁদের মরুভূমিতে সেই এসেছে শীতল মেঘছায়া!

গাড়িটা ছাড়বে, সর্বাণী বাইরে থেকে জানালার মধ্যে দিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন, 'আর দু'তিন-দিন অন্তর চিঠি দিস খুকি, দেরি হলেই আর বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারবো না। বেশ বড়ো করে ভালো দেখে চিঠি দিস, তোর খবর পাবার জন্যে এ-দিককার সমস্ত বাড়ি গলা বাড়িয়ে থাকবে।'

বিনায়কবাবু বিগলিত গলায় উচ্চারণ করলেন, 'দুর্গা। দুর্গা!'

গাড়িটা ছেড়ে দিলো।

চলে এলো সে কলকাতায়।

চলে এলো সে দেয়ালের দেশে। হাড়ের মতো শুকনো একটা বাড়িতে।

কলেজ আর বাড়ি, বাড়ি আর কলেজ, ব্যস্—এর বাইরে এক নিশ্বাসে সমস্ত কলকাতা গেছে ফুরিয়ে। কেবল সার-বাঁধা কতোগুলি ইঁটের নিষ্ঠুরতা।

দুদিনেই তার মামা ক্ষেত্রদাসবাবুকে চেনা গেলো। ইঁটে এবার শ্যাওলা ধরেছে।

হলোই বা তিন মিনিটের রাস্তা, কলেজে তাকে বাসেই যেতে হবে।

'কতোটুকুন বা পথ,' বীথি অল্প একটু হেসে বললে, 'আমি এক দৌড়েই চলে যেতে পারবো।'

'না, রাস্তায় নেমে আর তোমাকে দৌড় ঝাঁপ করতে হবে না।' ক্ষেত্রবাবু গাম্ভীর্যে অটল হয়ে রইলেন।

'কিন্তু মিছিমিছি কতোগুলি খরচ হয়ে যায়, মামাবাবু।'

'খরচই যদি না হবে, তবে আর তোমাকে পড়তে দিয়েছে কেন?'

'তোর খরচের জন্যে কি ভাবনা?' মামিমা স্নিগ্ধ গলায় বললেন, 'তোর তো স্কলারশিপের টাকাই আছে।'

তার স্কলারশিপের টাকা দিয়ে কি হয়, সেই সম্বন্ধে মামিমার সঙ্গে সে আলোচনা করতে চায় না। তবু আরেকবার সে চেষ্টা করে দেখলো, বললে, 'কেন, টুকু-দা, টুকু-দা আমাকে এইটুকু রাস্তা পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে না? সেও তো ঐ পথেই রোজ কলেজ যায়।'

টুকু ক্ষেত্রবাবুর ছেলে। স্কটিশে বি-এ পড়ছে।

টুকু চোখা একটা চিপটেন কাটলো, 'তোমার রীতিমতো লজ্জা করা উচিত, বীথি। সামান্য এইটুকুন পথ, তা কিনা তুমি একটা ছেলের কাঁধ ধরে পার হয়ে যেতে চাও? ছেলেদের সঙ্গেই যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এ-কথা তুমি ভুলে গেলে এরি মধ্যে?'

বীথি বাবাকে চিঠি লিখলো। বাবা নির্বিবাদে মামার কথায় সায় দিলেন। না-হয় চার টাকা গেলোই গরচা, তবু স্থানীয় যে অভিভাবক, তাঁর বিরুদ্ধে মুখ বাঁকায় তার সাধ্য কি। বাপ-মায়ের মতো তাঁর সম্মানটাও তার বাঁচিয়ে চলতে হবে।

ঠিকই তো, সর্বাণীও চিঠি লিখলেন, এ-কথা তাঁরা একেবারেই ভেবে দেখেননি। ঠিকই তো, কলকাতা তো সুন্দরবনেরই কাছাকাছি, তার রাস্তাগুলি সাপে-শ্বাপদে গিসগিস করছে। না-হয় বাজার-খরচের ফর্দটা একটু সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে, তাই বলে রাস্তা দিয়ে বীথির হনহনিয়ে যাওয়া চলবে না।

ক্ষেত্রদাসবাবুর অবস্থাটা ঢঙে বসে নেই, বরং প্রায় সুড়ঙে বলা যায়। ছোট দোতালা একটা বাড়ি—বাড়ি না বলে একটা গুহা বললেই মানানসই হয়—উপরে তিনখানা মোটে ঘর, নিচের তিনখানাকে বলতে পারো তিনটে বাক্স—সমস্ত সংসার উপরের সেই তিনখানা ঘরেই হাঁটু ও কনুইয়ে ঠেলাঠেলি করে কোনো রকমে জায়গা করে নিয়েছে। একখানাতে বপুষ্মান ক্ষেত্রদাসবাবু নিজে আর মাঝারি বয়সের ছেলেপিলেরা, ও পাশেরটাতে স্কুল কলেজের জোয়ান ছোকরারা, আর এটাতে মামিমা, মেয়েরা, কোলের বাচ্চাগুলি আর বীথি। প্রাণীই যেখানে এতো, তখন সেই অনুপাতে তাদের উপকরণের কথা ভাবো। প্রতিটি পা মেপে-মেপে দবের কথা, প্রতিটি নিশ্বাস মেপে মেপে চলতে

হয়। ট্রাঙ্কের কোণ লেগে তোমার কাপড়টা ছিঁড়েছে তো তুমি অল্পে সেরে গেছ, ওদিকে ঐ আলমারিটা যে তোমার ঘাড়ে এসে পড়ছিলো। ছেলেরা চেঁচামেচি-মারামারি করছে তো সেটা কিছুই নয়, ওদিকে তোমার বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়ে যে চৌবাচ্চায় নৌকো ভাসায়নি, তোমার বাবার ভাগ্যি।

বীথি কোনোদিকে তাকিয়ে দেখলো না—চারপাশের এই দেয়ালের মধ্যে কারা আছে বা কারা নেই, বা, সত্যি এই দেয়ালের বাইরে আর কোনো কিছু আছে কি না—কোনোদিকে চেয়ে দেখলো না, শুধু তার অক্ষরীভূত বইয়ের পৃষ্ঠাগুলিতে সে তৃষ্ণার্তের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যখনই ফাঁক পায়, তখনই সে বই নিয়ে বসে, হোক গরম, হোক ঠাণ্ডা, কামড়াক মশা, উড়ুক তেলাপোকা, না থাক তার টেবিল-চেয়ার, না থাক বা একটা ফাউন্টেন-পেন, কানের কাছে যতো খুশি ছেলেরা কামান দাগুক, ছোকরাদের ঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে যতো ইচ্ছে সঙ্গীতালাপ চলুক, বীথি এক ইঞ্চি টললো না। আলোর বিল বাড়ছে, বেশ, সে নিজের খরচে মোমবাতি জ্বালিয়ে নেবে, মামিমার কি কাজে বসবার টুলটা ছেড়ে দিতে হবে, বেশ, মেঝেতেই সে পড়তে পারবে পা ছড়িয়ে। ছাত্রত্ব একটা ব্রত—মনে করো ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের কথা—যতো তার বাধা, ততো তার বিস্ফারণ। বাধাই যদি না সে অতিক্রম করতে পারলো, তবে কি ছাই সে চোখের সামনে বই খুলে ধরেছে! বাবা-মাই বা কি ভাববেন, অন্য লোকেরাও বা কি বলবে? সামান্য শারীরিক কষ্ট সে সহ্য করতে পারলো না, পারলো না সে সাংসারিক কতোগুলো অসুবিধে এড়িয়ে যেতে, এবং তারি জন্যেই তার পরীক্ষার ফল এবার খারাপ হলো—এ-কথা সে পাঁচজনের সামনে মুখ দেখিয়ে বলবে কি করে? অসম্ভব। বীথি কোমরটা আঁট করে বেঁধে

নিলে। মামিমা যতোই কেননা তাকে ফরমাস করুন, ছেলেটাকে একটু ধর্, ধোবার বাড়ির কাপড় মিলিয়ে নে, এ-বেলার রান্নাটা তুইই নামিয়ে দিয়ে আয়—বীথি কিছুতেই তার খুঁটি ছাড়বে না। পাশ—তার পাশ করে যেতে হবে ধাপে-ধাপে, আরো ভালো, আরো বেশি নম্বর পেয়ে-পেয়ে, তার বাবা-মা'র মুখোজ্জ্বল করতে হবে—তার বাবা-মা, সে ছাড়া গর্ব করবার যাঁদের আর কিছু নেই। তার দুই চোখের তারার মধ্যে তার বাবা মা'র মুখ যে তার দিকে তাকিয়ে আছে সব সময়।

অতএব বীথি আর কোনোদিকে তাকালো না। ব্রামানটিপকে কি করে বারবারায় নিয়ে যেতে হয়, এক্ষুনি, দুর্বটা এই জাল দিয়ে নিতে-নিতে, এই মুহূর্তে, তার শিখে ফেলা চাই।

একদিন মামিমা চোয়াল দুটো লম্বা করে বললেন, 'হ্যাঁ রে বীথি, তুই তো নাচ জানতিস শুনেছিলুম। একবার কোন সভায় নাকি নেচে কি মেডেল পেয়েছিলি, তোর মা লিখেছিলো। আমাকে একটু দেখা না।'

বীথি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা আছাড় খেলো, 'তোমাকেও মা লিখেছিলো নাকি?'

'নইলে জানবো কি করে? দেখা না একবারটি।'

বীথি লজ্জায় ম্লান হয়ে গেলো। বললে, 'পাগল!'

'কেন, সভার মধ্যে নাচতে পারলি, আর একা আমার সামনে পারবিনে?'

'তখন আমি যে ছোট ছিলুম, মামিমা।'

'আর বড়ো হয়েই বুঝি নাচা যায় না। নাচ তো শুনেছি একটা শিল্প বিদ্যা।' মামিমা চোখ দুটো চটুল করে তুললেন, 'আচ্ছা, দরজাটা না হয় বন্ধ করে দিচ্ছি, ছেলে-ছোকরারা কেউ উঁকি মারতে পারবে না। আমার সামনে মেয়ে হয়ে তোর নাচতে লজ্জা কিসের?'

মামিমার কথাগুলি তাকে টুকরো-টুকরো করে কাটতে লাগলো। বড়ো

হয়ে যে আর ভদ্রতা বাঁচিয়ে নাচা যায় না, একটা বয়েস পর্যন্তই নাচটা যে মেয়েদের শিল্প-বিদ্যা, পরে সেটা দাঁড়ায় যে একটা শরীরের বিজ্ঞাপনে, মামিমার পরের কথাগুলোতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার এখনকার নাচ শুধু মামিমাই দেখতে পাবেন, তা-ও দরজা বন্ধ করে। সেখানে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই—সেটা তা হলে তাদের দেখা হবে না, সেটা হবে তার দেখানো। বীথি অপমানে কালো হয়ে উঠলো।

বইয়ের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে রেখে রূঢ় গলায় বললে, 'ও-সব আমি কবে ভুলে গেছি, মামিমা।'

তার সমস্ত অস্তিত্ব বিষ হয়ে ওঠে, যদি কেউ তাকে কোনো ছুতোয় এই শরীরের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। শরীরকে তার মনোহীন, পবিত্র অসম্পৃক্ততায় দেখতে সে রীতিমতো ভয় পায়, তার ঘৃণা ধরে যায় তার সম্বন্ধে কোনো বিলোল প্রগল্‌ভতার কথা মনে হলে। কোমলতায় লতিয়ে সে একখানা ভালো শাড়ি পর্যন্ত পরে না। তার যে শরীর নামে একটা ভার বহন করে বেড়াতে হয়, সেটা যেন তার গভীর একটা লজ্জা—শরীরটাকে মুছে দিয়ে বাঁচা সম্ভব হলে সে সবাইর চেয়ে আগে বাঁচতো। তার সাধনা সুন্দর হবার নয়, সফল হবার। শরীর তার কাছে ঘৃণ্য একটা আবর্জনার সামিল, জীবনে একটা অবান্তর অত্যাচার। যতো তাকে ভুলে থাকা যায় ততোই তার মুক্তি, ততোই তার পবিত্রতা।

মামিমা এবার অন্য জায়গায় ঢু মারতে চেষ্টা করলেন, 'তুই তো গানও জানতিস শুনেছিলুম। কই, গানও তো এক-আধটা গাস না আজকাল।'

'সে তো সুর নয়, মামিমা,' বীথি হেসে বললে, 'সে অসুর। ছেলেবেলা সবাই অমন হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে।'

'হলোই বা না,' মামিমা গম্ভীর চালে বললেন, 'চড়া জায়গায় গলাটা তো একটু ছাড়তেই হবে।'

'কিন্তু এবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েও যে পার পাওয়া যাবে না।'
'আহা, গলাটা একটু নামিয়েই ধর্ না। মাঝে-মাঝে চর্চাটা একটু রাখা ভালো। ছেলেদের আজকাল আবার বাই হয়েছে গান-জানা মেয়ে চাই।'
বীথি দুই চোখে লেলিহান জ্বলে উঠলো, 'ছেলেরা কি চায় না-চায় সেই অনুসারে আমাদের বাড়তে হবে নাকি?'
'তা ছাড়া আবার কি। নইলে তোরা ঝাঁক বেঁধে পড়তে এসেছিস কেন? ছেলেরা চায় বলেই তো। যেদিন আবার চাইবে না, দেখবি, আবার সেই গৌরীদান চলেছে।'
'রাখো,' বীথি রাগে একেবারে ঘেমে উঠলো, 'তোমার সেই ছেলেদেরই বা কে চায়? তাদেরই বা কদ্দূর দৌড়, সব জানা গেছে, মামিমা। দেখি না,' বীথি বইর উপর তীব্র চোখে ঝুঁকে পড়লো, 'দেখি না কে কাকে চায়, কে কার মতো হয়ে ওঠে।'
'তর্ক রেখে দে, বাপু,' মামিমা তাকে ভেজাতে চেষ্টা করলেন, 'ঠাণ্ডা গলায় এখন একখানা গান ধর্। কেত্তন যদি জানিস তো তোর মামাবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি।'
বীথি একেবারে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে দিলে। বললে, 'আমার এখন ভীষণ পড়া।'
আরো একটা জিনিস বীথি জানতো। ভাগ্যিস মামিমা সেটা শোনেননি। সেই কবিতার খাতার পিছন দিকের শাদা পৃষ্ঠাগুলিতে সে এখন বটানির নোট টুকছে।
চমকে উঠে মাঝে-মাঝে বীথি ঘরের দিকে তাকায়—যদি তাকে একটা ঘর বলতে পারো—আর তার সমস্ত কবিতা চারপাশের স্যাঁতসেঁতে শাদা দেয়ালের মতো শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। নিজের দিকে চেয়ে তুমি একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারো তার ফাঁক কোথায়! প্রতিক্ষণে ঘরের মধ্যে চলেছে একটা শিবতাণ্ডব। কোন ছেলেটা মেঝের থেকে কখন তরকারির খোসা তুলে খাচ্ছে, কোন দুটোয করছে কামড়াকামড়ি, কে তোমার মাথা তাক করে লাট্টু ঘোরাচ্ছে বনবনিয়ে, কখন বা এলো মামিমার হুকুম সংসারের তাঁবেদারিতে। এখানে, এ-ঘরে বসে, পরের কথাই একধার থেকে মুখস্থ করা যায়, নিজের কথা আর লেখা চলে না। যে-মুহূর্তে ধরো তুমি একটা মিল ভাবছো, সেই মুহূর্তেই ধোবা এসেছে কাপড় নিয়ে, কিম্বা কে চাইলো এক গ্লাশ জল, কে দিয়ে গেলো তার সার্টে বোতাম লাগাতে, কিম্বা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে কোন ছেলেটা একেবারে চিৎপটাং। সব সময়েই তুমি পায়ের ডগায় খাড়া হয়ে আছো। সব সময়েই একটা ভূমিকম্প লেগে আছে।

তার বাবার আর-আর সব কথার মাঝে একটা কথা খুব বেশি তার মনে পড়ে আজকাল। বাবা বলেছিলেন, 'মেয়েরা কি করে কি লিখতে পারবে বল্? তাদের নিজের বলে আলাদা কোনো একটা ঘর ছিলো না।'

ঘর, ঘর, ছোট, সামান্য, নিরিবিলি একখানা ঘর—নিজের জন্যে কবে সে একখানা ঘর পাবে?

উঃ, কবে সে যেতে পারবে এখান থেকে, তার মা'র কোলে, তার মাঠের কোলে! কতোদিন সে আকাশে চাঁদ উঠতে দেখেনি, মাঝরাতের সেই হলদে চাঁদ, শেষরাতে তার সেই মৃত্যুতে লাল হয়ে ওঠা! সে ভুলেই আছে বাঙলা দেশে শরৎকাল বলে কোনো একটা ঋতু আছে কিনা, ভুলেই আছে সে দুপুরের আকাশের সেই নীল নিঃশব্দতা। ভুলেই আছে সে সব।

ছি, দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে বীথি নিজেকে শাসন করলো, তার

নিজের জন্যে দুঃখ করা তার শোভা পায় না। যখনকার যা, তখনকার তাই। এখন শুধু তার পড়া, কলম ঠেলে-ঠেলে পরীক্ষার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া আর সব তার বিলাসিতা, ছাত্রত্বের যা পরিপন্থী। পড়ো, পড়ো, আরো মন দিয়ে পড়ো, ছেলেরা যে তোমাকে ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলো।

তবু এতোতেও যেন তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়া হবে না। মামাবাবু কোথেকে এক বিয়ের সম্বন্ধ কুড়িয়ে এনেছেন।

ছেলে নাকি মেডিকেল কলেজে পড়ছে, বাপের অবস্থাটা সোনা দিয়ে মোড়া—বিনায়কবাবুর কাছে চিঠি গেলো—বীথিকে পছন্দ হলে এবার আর হাতছাড়া হতে দেয়া নয়।

বিনায়কবাবু চিঠির সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, মামিমার মুখেই অবিশ্যি সেটা শোনা গেলো, এবং শোনা গেলো কিছু বিস্তৃতভাবে, কিন্তু শুনে বীথি উঠলো সর্বাঙ্গে পুলকিত হয়ে। বাবা লিখেছেন ' যে-ছেলে এখনো মাত্র কলেজে পড়ছে, এখনো রোজগার করতে শেখেনি, সে বীথির যোগ্য নয়। বেশ, রোজগেরে পাত্রও ক্ষেত্রবাবুর হাতে আছে। পাটনা সেক্রেটেরিয়েটে স'-শো টাকায় কাজ করছে, দাবি দাওয়া কিছু নেই, শুধু যাতায়াত-খরচ বাবদ পাঁচশো টাকা। বললেই তারা দিন-ক্ষণ দেখে মেয়ে দেখে যেতে পারে।

বাবা এবার কি উত্তর দেন বীথি প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

বাবা লিখলেন ছেলের স'-শো টাকার চাইতে বীথির কেরিয়ারের দাম অনেক বেশি। তা ছাড়া, যাতায়াত খরচ বাবদও যারা টাকা চায়, তাদের ঘরে তিনি মেয়ে দিতে পারবেন না। এতো অর্থব্যয় করে তিনি মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, ফের অর্থব্যয় করে তার বিয়ে দিতে নাকি ?

চিঠিটা খামের মধ্যে মুড়ে রাখতে-রাখতে মুচকে হেসে ক্ষেত্রবাবু বললেন,

'মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে পণ এড়িয়ে যেতে। বিনায়ক বুড়ো বয়সে যে এ কি ধুয়ো ধরলো বোঝা দায়। মেয়ের কেরিয়ার! মেয়ের কেরিয়ার! কেরিয়ার বলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না নাকি? মেয়েকে মানুষে ততোদিনই লেখাপড়া শেখায়, যতোদিন তার বিয়ে না হচ্ছে। পাত্র জুটলেই পাততাড়ি গুটিয়ে ফেল। নয়তো—এ কি অন্যায় কথা! এমন সাধা সম্বন্ধ!'

আচ্ছা, কানাকড়িও দাবি-দাওয়া নেই, ক্ষেত্রবাবু টাটকা এক বি-সি-এস্ ধরে আনলেন। তার বাবা ফর্দ করে গুনে-গুনে একশো মেয়ে দেখতে বেরিয়েছেন। নিরানব্বুইটি দেখেছেন, পছন্দ হয়নি, বাকি একটি হতে বীথির বাধা কি! যদি তার কপালে থাকে, লেগেও যেতে পারে বা। হোক না হোক, দেখাতে কি দোষ!

বীথি একেবারে ফাঁপরে পড়লো। এবার আর বাবা পালাবার পথ পাবেন না।

বিনায়কবাবু সত্যি এবার পথ পেলেন না। কিন্তু লিখলেন মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমার কথাটাই চূড়ান্ত নয়, মেয়ের বয়েস হয়েছে, তারো তাই একটা মতামত আছে—তাকে একবার জিগগেস করা দরকার।

ভাগ্যিস তার বয়েস হয়েছিলো। বীথি মনে মনে আনন্দে একটা অভ্রভেদী চীৎকার করে উঠলো।

আশ্চর্য, তাকেও কিনা জিগগেস করা হয়েছিলো তারপর।

সে কি ভয়ানক কথা! তারো একটা মতামত আছে। সেটা সূর্যের মতো স্পষ্ট, অন্ধকারের মতো ধারালো। উঃ, সে কি তীব্র উন্মাদনা! তারো একটা মতামত আছে। সেটা সে এবার, এতোদিনে, উচ্চারণ করতে পারবে। বীথি সমস্ত রক্ত-চলাচলে বিভোর হয়ে উঠলো।

মামিমা এসে বললেন,'কি লো, বাজি ?'

বীথি তাড়াতাড়ি বইয়েব পৃষ্ঠাগুলি ঘাঁটতে শুরু করলো। দ্রুত, ব্যস্ত গলায বললে, 'দাঁড়াও, আমাব এখন নিশ্বাস নেবাবও সময় নেই, পিটিশিয়ো প্রিন্সিপাই নিযে মহা গোলমালে পড়ে গেছি। এ বলে এ কথা, ও বলে, আবেক। অফুল।'

মামিমা তবু খানিকক্ষণ গাঁইগুঁই কবেছিলেন।

বীথি দুই চোখ স্পষ্ট, প্রখব কবে তুলে ধবলো, দৃঢ়, রূঢ় গলায বললে, 'পাত্রটি কে, ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিযো আমাব কাছে। বুকেব ছাতি ক' ইঞ্চি, ক' গজ লং-জাম্প দিতে পাবে, বিস্টেব বেড কতোটা ? সাঁতাব দিযে কতোক্ষণ থাকতে পাবে জলে, এনডিযোবেন্স সাইক্লিং-এব বেকর্ড কতো ? বেশ তো, আসতে নেহাত লজ্জা পায, আমিই না-হয গিযে দেখে আসবো একদিন। আমাব সামনে চেয়াবে ঘাড় হেঁট কবে বসবে, আব আমি বলবো, হাঁ কবো তো, তোমাব দাঁত দেখি। দেখি একটানা ক'টা বৈঠক দিতে পাবো।' বীথি আবাব বইযেব মধ্যে ডুবে গেলো, 'অফুল।'

সেই থেকে ক্ষেত্রবাবু একেবাবে চুপ কবে গেলেন। তাঁব সেই স্থূল নিস্তব্ধতাটা বীথি কি নিদারুণ উপভোগ কবছে। কেবল বিযে আব বিযে। বিযে ছাড়া বীথিব যেন আব কোনো কাজ নেই।

শুধু বই ছাড়া আর-কাউকেও বীথি বন্ধু করেনি। এ-বাড়িতে তার সমবয়সী কোনো মেয়ে ছিলো না, আত্মীয়-অনাত্মীয় ছিলো কতোগুলি ছেলে, কিন্তু তাদের কাছে তার উপস্থিতিটা প্রায় একরকম উহ্যই ছিলো বলা যায়। মাঝপথে সিঁড়িতে কারুর সঙ্গে আচমকা দেখা হলে সে আর পাশ দিয়ে সরে দাঁড়ায় না, একেবারে সোজা উঠে যায় উপরে বা নেমে যায় নিচে, যেখান থেকে গোড়ায় সে রওনা হয়েছিলো। ধারে পারে পুরুষের কোনো পায়ের শব্দ শুনলে সে তখুনি তার পড়ার স্বরটা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়, আর কখনো কোনো ছেলে যদি কোনো কাজে এই ঘরে ঢুকে পড়ে, ততোক্ষণ বীথি শূন্যতার একটা পাথর হয়ে থাকে, নিশ্বাস নিতে পারে না। কারু সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, কারুর সে মুখ দেখে নাম বলে দিতে পারে কিনা সন্দেহ। লক্ষ্মণ কেবল পুরুষের মধ্যেই থাকবে, এ অসম্ভব। এদের সবাইকে সে ভয় করে, এবং যাকেই আমরা ভয় করি, তাকেই করি ঘৃণা। তাই কোনোদিন কাউকে সে তার ছায়ায় এসে পর্যন্ত দাঁড়াতে দেয়নি, কাছাকাছি যেমনি সে কারুর গলা শুনেছে, অমনি চোখের পলকে নিজেকে এনেছে নিবিয়ে, শাড়িটাকে আরো বেশি ঘন করে তুলেছে চারপাশে। মনে থাকে যেন, মা তাকে প্রতিমুহূর্তে সাবধান থাকতে বলেছেন।

কিন্তু দরজা আটকে টুকু-দাকে ঠেকায় তার সাধ্য কি। দমকা হাওয়ার মতন যখন-তখন সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

টুকু-দার সামনে সে আর আপাদমস্তক মেয়ে থাকতে পারে না।

'কি এখনো, সন্ধের সময় বই নিয়ে বসেছ, বীথি ?' টুকু একদিন একেবারে তার টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো, 'চলো, ফিল্‌ম্‌ দেখে আসি।'

টুকু-দার কথায় সমস্ত বাহির, বাঁশির স্বরের মতো কলকাতার দীর্ঘ সমস্ত রাস্তা, তাকে যেন একসঙ্গে ডাক দিয়ে উঠলো। দেয়ালের বাইরে হাওয়া উঠলো মর্মরিত হয়ে। বীথি খুশিতে উছলে উঠে বললে, 'মামাবাবু নিয়ে যাবেন বলেছেন নাকি ?'

'মামাবাবু কেন,' টুকু প্রায় ধমকে উঠলো, 'আমার সঙ্গে যেতে পারো না ?'

'পারি, কিন্তু মামাবাবুকে বলেছ ?'

'বয়ে গেছে আমার বলতে,' টুকু বিরক্ত মুখে বললে, 'এইটুকুন একটা রাস্তা পেরিয়ে আমার সঙ্গে সিনেমায় যাবে, তাতে বাবার একটা লিখিত মত নিতে হবে নাকি ?'

বীথি হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলো, 'তিনি তো বাড়িতে নিচেই আছেন এখন, মুখের একটা কথাই বা নাও না চেয়ে।'

'বেশ, জানতেই তো পারবেন স্বচ্ছন্দে। আমরা তো আর তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে যাবো না। তুমি ওঠো,' টুকু তাকে তাড়া দিলো, 'দুজনে যখন তৈরি হয়ে নিচে নামবো, আর তিনি যখন জিগগেস করবেন : কোথায় যাচ্ছিস রে তোরা ? তখন, তখন বলা যাবে। নেহাত না বললে আর নয় বলে বলা যাবে। আগে থেকে মত নিতে যাবো কেন ? কারো ঘরে আগুন দিতে তো আর যাচ্ছি না।'

'কিন্তু আজ থাক, টুকু-দা—' বীথি ক্লান্ত গলায় বললে।

'কেন, থাকতে যাবে কেন ?' টুকু উৎসাহে ঝলমল করে উঠলো, 'খুব ভালো ফিল্‌ম্‌। ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্‌। তুমি তো তার নামও শোনোনি—কি তুমি ? এতোদিন ধরে কলকাতায় এসেছ, একদিন বাড়ির বাইরে পা

কালে না, দেয়ালের মধ্যে অন্ধকারে রইলে ঘুপটি মেরে। দিনে যা দুবার কলেজের বাসে চড়লে, পা দিয়ে ছুঁলে না একবার কলকাতার মাটি। দেখলে না একবার তার রাত্রের চেহারা। বেশ, বাবার মতই আমি নেবো, দেখি,' টুকু ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

ততোধিক ব্যস্ততার সঙ্গে বীথি তাকে বাধা দিলে। বললে, 'তুমি ও-সব কথা গিয়ে বললে মামাবাবু ভাববেন আমি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি। শোনো, দাঁড়াও, আমি যাবো না,' বীথি লজ্জায় একেবারে মুষড়ে গেলো, 'একা তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারি না কোথাও।'

'কেন, আমি কি দোষ করলুম ?' টুকু থেমে গেলো, 'আমি তোমাকে গাড়ি-ঘোড়া কাটিয়ে রাস্তা ঠিক পার করে আনতে পারবো না ভেবেছ ?'

'তা হয়তো পারবে,' কথা বলতে গিয়ে বীথি ঘেমে উঠলো, 'কিন্তু থাক—মামাবাবু মত দেবেন না কিছুতেই, মিছিমিছি একটা গোলমাল হবে—তুমি একাই গিয়ে দেখে এসো।'

'কেন, আপত্তি করবেন কেন ?' টুকু ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলো, 'আমি তোমার দাদা না ?'

বীথিও উঠলো ছেলেমানুষের মতো হেসে। বললে, 'তা তো মামাবাবুও জানেন। থাক গে, ও আমি দেখবো না,' বীথি তার স্বরে সমাপ্তির একটা রেখা টানলে, 'ফিল্ম্ দেখাটা ভালো নয় শুনেছি।'

'ভালো নয় মানে ?' টুকু দুই চোখে জ্বলে উঠলো, 'তোমায় কে বললে ? কোন মূর্খ ?'

'চারপাশে হামেশাই তো শুনতে পাচ্ছি,' বীথি অল্প একটু হাসলো, 'সংসারে মূর্খেরই তো রাজত্ব, টুকুদা, মূর্খরাই তো সংখ্যায় বেশি শক্তিশালী।'

'ভালো নয়,' টুকু একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়লো, 'সংসারে কোন

জিনিসটা ভালো জিগগেস করি ? আমাদের জন্মটাই ভালো, না, আমাদের মৃত্যুটাই খুব সৎ ?'

বীথি আরেকটু হলে প্রায় গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিলো। তাড়াতাড়ি দাঁত দিয়ে জিভটা কামড়ে সে-হাসি সে পিষে ফেললে।

'পৃথিবীতে আমরা একজন যে মেয়ে, আরেকজন যে ছেলে—এটাই বা কোন ভালো ব্যবস্থা ?' টুকু রাগে রি-রি করতে লাগলো, 'আমরা কেউ ফিল্ম্ দেখে খারাপ হচ্ছি, কেউ-বা না-দেখে খারাপ হচ্ছি, তফাতটা কোথায় ? খারাপ হওয়া বলে একটা জিনিস যখন পৃথিবীতে আছেই, কারু-কারু তা না হয়ে আর উপায় কি।'

বীথি উদাসীনের মতো বললে, 'বেশ তো, তুমি যাও না একা, দেখে এসো।'

'আর তুমি ?'

'আমি এখন পড়বো।'

'পড়বে ?' টেবিলের উপর থেকে খোলা বইটা একটানে কেড়ে নিয়ে টুকু বললে, 'কেন তুমি পড়ছ ? পড়ে তোমার কি হবে জিগগেস করি ?'

'তুমিই বা কেন পড়ছ ? তোমারই বা কি হবে ?'

'আমি—আমি চাকরি করবো।'

'আর আমি বুঝি ঘোড়ার ঘাস কাটবো বসে বসে ?' বীথি হঠাৎ, এক মুহূর্তে, তার ব্যক্তিত্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, চাপা, কঠিন মুখে বললে, 'আমি—আমি চাকরি করতে পারবো না ? তোমার মতো আমারও জোড়া করে হাত পা নেই ?'

'কিন্তু আমার মতো গায়ে তোমার জোর নেই, আমার মতো মাথায় তোমার বুদ্ধি নেই,' টুকু যেন একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসলো, 'সে-কথা হচ্ছে না। কিন্তু তুমি কি চাকরি করবে জিগগেস করি ?'

'শাই কেন না কবি,' বীথি রাগে জ্বলে উঠলো, 'তোমার চেয়ে ভালো। তোমাবই বা কি চাকরি মিলবে শুনি? আর তুমি যদি একটা যোগাড় কবতে পারো, আমি পাববো না? পুরুষের চেয়ে আমবা এতো ছোট?'
'তা তো একটু ছোটই,' টুকু হেসে ফেললো।
'কিসে?'
'দৈর্ঘ্যে, দৈহিক শক্তিতে, মৌলিকতায়। সে-কথা হচ্ছে না, বীথি,' টুকু তার মহান নির্লিপ্ততায় সবে দাঁড়ালো, 'মাস্টারি হয়তো তোমাব একটা জুটে যাবে কোনোবকমে। তা নয়, আমি তাই বলতে চাচ্ছিলুম না—'
'তুমি যদি সামান্য একটা কেবানি হতে পাবো,' বীথি আবাব ফুঁসে উঠলো, 'আমাব মাস্টাবি কবতে কি দোষ? আমি তাব জন্যে তোমাব ছোট হযে গেলুম বলতে চাও?'
'পাগল!' হাসিতে টুকুব গাম্ভীয গেলো গলে, 'আমাব সঙ্গে তুলনা দিচ্ছ কি! তোমাব মতো গোগ্রাসে অমন মুখস্থ কবা দূবেব কথা, কোন পেপাবে আমাব কি বই, তাই আমি জানি না। আমাব সঙ্গে যে তুলনা দিচ্ছ তাতেই তো তোমাব ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। আমি হযতো একটা কেবানিও হতে পাববো না কোনোদিন।'
বীথি হেসে বললে, 'তবু তো মেযে হয়ে সংসাবে একজন পুরুষেব চেযে অগ্রগণ্য হতে পাবলুম। অন্তত সেই একজনেব চেয়ে, যে সব সময়ে কেবল মেয়েদেব ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণিত কববাব জন্যেই বেঁচে আছে। বলো, তুমিই বলো, সেটাই বা কি কম কথা!'
টুকুব পুরুষত্বে ঘা লাগলো। বললে, 'আমি তো জানতুম বিয়ে হবাব জন্যেই মেয়েবা পড়ে, বিয়েটাই মেয়েদেব একচেটে চাকবি।'
'এতো কম জেনে আমাব সঙ্গে তর্ক কবতে এসো না, টুকু-দা।' বীথি আবেকটা বই খুলে বসলো, 'যাও, ফিল্ম্ ওদিকে আরম্ভ হয়ে গেলো।'

'বুঝলুম, তুমি চটেছ,' টুকু টুলের উপব আবো গ্যাঁট হয়ে বসলো, 'বাগ কবে থাকলে তাব সঙ্গে অবিশ্যি আব তর্ক কবা যায় না। মেয়েবা অমনি বেগে উঠেই তর্কে জিতে যায়, ওটা তাদেব ব্রহ্মাস্ত্র। আমবা নিতান্ত উদাব বলে হাসিমুখে হাব স্বীকাব কবতে পাবি।'

'তোমাদেব কাছে, বক্ষে কবো, আব আমবা উদাবতা চাই না, পবিচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই এখন থেকে।' বীথি গভীব মনোযোগে বইয়েব অক্ষবগুলি পযবেক্ষণ কবতে লাগলো, 'পুরুষে যা পাবে তা-ও আমবা পাবি কিনা একবাব দেখতে দাও।'

'উঃ, সামান্য একটা মাস্টাবিব জন্যে তুমি কি অসাধ্যসাধনই না কবছ, বীথি,' টুকু চোখে সস্নেহ একটা বিদ্রূপেব ভঙ্গি কবলে, 'কিন্তু ওটা আব কেন? তোমবা তো জন্ম থেকেই মাস্টাব, তোমাদেব ভেতবে আদ্যি-কালেব বুড়ো একটি জ্যাঠাইমা আছে লুকিয়ে। আব ওটাব বিস্তৃত চর্চা কেন? এখন অন্য-কিছুতে হাত পাকাও।'

'সে পবামর্শ পুরুষেব কাছ থেকে নিতে হবে না,' বীথি কঠিন হয়ে বললে, 'সংসাবে এতো অপোগণ্ড নাবালক থাকতে জ্যাঠাইমা না হয়ে উপায় কি বলো? সেই জ্যাঠাইমাই এখন তোমাকে এখান থেকে উঠে যেতে বলছে। আমি পড়বো—আমাকে এখন পড়তে দাও।'

টুকুব একইঞ্চি ওব নড়বাব নাম নেই। হাসিমুখে বললে, 'সেই অপোগণ্ড শিশুটি সামান্য কৌতূহলী হয়ে তোমাকে জিগগেস কবছে, পড়ে তুমি কি পাও, শুধু পড়ে তুমি কি জানতে পাববে?'

'না পড়েই বা কি জানছিলুম এতোদিন?'

'ছেলেবা তোমাদেব চেয়ে কতো বেশি জানে, শুধু বই পড়ে তুমি তাদেব নাগাল পাবে কি কবে?'

'কি জানে তাবা?'

'ধরো, তুমি কোনোদিন রবিঠাকুরকে দেখেছ ?'

'নাই বা দেখলুম, পড়তে তো পারছি,' বীথি চোখ তুলে বললে, 'তুমি তো বঙ্কিম চাটুজ্জেকেও দেখনি। জীবন্ত তাই তোমার একেবারে বয়ে যাচ্ছে, না ?'

'ছি-ছি-ছি, এখনো কিনা রবিঠাকুরকে দেখনি। নিতান্তই তুমি একটা মেয়ে, বীথি।'

'রাখো। তুমি তো আমাদের কলেজের বনমালী বেয়ারাকে দেখনি। তবু তোমার এখনো বাঁচতে ইচ্ছে করছে ?'

'আচ্ছা, তুমি বলতে পারো পৃথিবীতে ক'টা নামজাদা ক্রফোর্ড আছে ?'

'আর তুমিই বলতে পারো আমাদের ক্লাশে ক'টা নীলিমা আছে ?'

'কার সঙ্গে কার তুলনা !' টুকু ঠোঁটের কিনারে তাচ্ছিল্যের একটা ইশারা করলে, 'পৃথিবীর কোনো খবরই তুমি রাখো না দেখি। আচ্ছা, বলতে পারো, জি-পি-ওর গম্বুজে ক'টা ঘড়ি আছে—কোনটার কি টাইম ?'

'আহা, সমস্ত পৃথিবীটা তো একমাত্র ছেলেদের জমিদারি কিনা !' বীথি রুখে উঠলো, 'আর তুমি বলো দিকি আমাদের কলেজের কম্পাউণ্ডে ক'টা দেবদারু-গাছ আছে ? আমার খোঁপায় ক'টা চুলের কাঁটা আছে ?'

টুকু গলা ছেড়ে হেসে উঠলো, 'বলো দিকি এখান থেকে তুমি কি করে ওয়েলেস্‌লি যাবে ?'

'আর তুমি বলো দিকি এখান থেকে তুমি কি করে জু-তে যাবে, সুন্দরবনের জঙ্গলে যাবে ?'

'যতোই কেন না তর্ক করো,' টুকু টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'ছেলেদের সঙ্গে কোনো ফিল্‌ডেই তোমরা পারবে না। মিছিমিছি কতোগুলি বইয়ের পোকা হয়ে কি লাভ ?'

'উদারতায় হার স্বীকার করছো নাকি, টুকু-দা ?' বীথি ভুরুতে একটা

গর্বের টান দিলে, 'একমাত্র পরীক্ষা-পাশের ব্যাপারে এসে পড়েছি বলেই তোমাদের ক্যাম্পে এমন সোরগোল পড়ে গেছে। দাঁড়াও না, সবুর করো না আরো ক'টা বছর, দেখ না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আরো একটু ফাঁকায় এসে আমাদের দাঁড়াতে দাও না—আইন করে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে তো বঞ্চিত করেছ, হাতে আমাদের আসতে দাও না কিছু টাকা-কড়ি, দেখ না কি হয়, দেখ না আমরা কি হয়ে উঠি।' টুকুর কিছু জবাব দেবার আগেই দোর-গোড়ায় ক্ষেত্রবাবুর আওয়াজ পাওয়া গেলো।

'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?' গলার স্বরটা তাঁর বিরক্তিতে ঈষৎ ধারালো। সেই স্বরে তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণ বক্রতাটা আবিল একটা স্পর্শের মতো টের পাওয়া যাচ্ছে।

'এই আমার ডিক্সনারিটা খুঁজতে এসেছিলুম, বাবা।' টুকু শ্লথ পায়ে বরফের উপর দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

হায় তার দৈর্ঘ্য, তার দৈহিক বলদীপ্তি, হায় তার অসম্ভব মৌলিকতা।

হাসবে না কাঁদবে বীথি কিছু ভেবে পেলো না।

আই-এ পরীক্ষা দিয়ে যখন সে এবার বাড়ি এলো, দেখলো বাড়ি-ঘরের দিকে চোখ মেলে আর তাকানো যায় না। গোয়ালঘরটা শূন্য, গরু দুটোকে হাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যদি খদ্দের জোটে। উঠোনে জন্মেছে রাজ্যের আগাছা, মজুর লাগাবার পয়সা নেই। দৈনিক বাজার করে এসে বাবার জুতোর হাঁ-টা আর সেলাই করা হয় না। সেজদির মতো বৃত্তি পায়নি বলে সেকেণ্ড-ক্লাশে উঠে ছোট বোনটার পড়া বন্ধ। ছোট-ছোট ভাই-বোনগুলির বই জোটে তো জামা জোটে না, মা'র হাতের কব্জিতে একগাছ করে ঢিলে শাখা শুধু ঠকঠক করছে। আর পিসিমা সব দিকে সবাইর মনের মতো করে তার জন্যে এখনো পাত্র খুঁজে মরছেন।

বাবা দিন-দিন ধারে যাচ্ছেন তলিয়ে। এই সুদূর মফঃস্বলেও কাবলিয়ালারা এসে ভিড় পাকিয়েছে।

বীথি বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলো।

'না, না, পড়া তুমি ছাড়তে পারবো না, সব-কিছুর চেয়ে বড়ো তোমার এই কেরিয়ার! গ্র্যাজুয়েট তোমার হতেই হবে যে করে হোক—আর অনার্স নিয়ে। ছেলেটাকে দিয়ে যা করানো গেলো না, তোমাকে তাই করতে হবে, বীথি। তোমার দিকে চেয়ে সব আমি পেরিয়ে যেতে পারবো। তুমি আমার ছেলের চেয়েও বেশি।'

তার দাদা দু-দুবার বি-এতে ঘায়েল হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছে।

বীথি বললে, 'তা হলে এখন কি করবে ভেবেছ?'

'ঐ ছেলেটাকেই বিয়ে দেবো।'

'বিয়ে দেবে! তাতে এগোবে কি?'

'নগদ কিছু টাকা পাওয়া যাবে যে। বেশি নয়, হাজার খানেক—তা ঐ ছেলেকে এই যে দিতে চাচ্ছে, আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।'

বীথি বিমর্ষ হয়ে গেলো, 'দাদার বিয়েতে তুমি পণ নেবে নাকি, বাবা?'

'না, না, তোর ভাবনা নেই—পাশ-করা মেয়ে নয়।' বিনায়কবাবু তার কাঁধে দুটো সস্নেহ চাপড় দিয়ে তাকে যেন আশ্বস্ত করলেন, 'নিতান্তই গেরস্ত-ঘরের মেয়ে, কথামালাটাও শেষ করেছে কিনা সন্দেহ। ওটার জন্যে আবার পাশ করা মেয়ে! ভগবান এই যে জুটিয়ে দিচ্ছেন, ওর কপাল ভালো।'

'কপাল ভালো তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ঐ হাজার টাকায় তোমার কি হবে?'

'তবু ক'টা দিন আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারবো,' বিনায়কবাবু তাঁর মুখ-চোখ ঘোরালো করে তুললেন, 'ঘাড়ের উপর দু দুটো বড়ো ভার বড্ড চেপে বসেছে, সে দুটোকে যা হোক করে নামিয়ে না দিলেই আর নয়। হাজার টাকাই বা আমাকে এখন কে দেয়?'

'কিন্তু দাদা রাজি হয়েছে?'

'রাজি না হলেই বা উপায় কি? আজ হোক, কাল হোক, বিয়ে তো ওকে করতেই হবে,' বিনায়কবাবুর মুখে প্রশান্ত একটি বিজ্ঞতা ফুটে উঠলো, 'হাজার খানেক টাকা যখন এখন এসেই যাচ্ছে আচমকা, তখন বুদ্ধিমান হওয়াটাই তো তার উচিত। কোনোদিন সে আর এতো টাকা একসঙ্গে দেখবে নাকি জীবনে?'

বীথি বোজা গলায় বললে, 'কিন্তু দাদার এখনো একটা চাকরির দেখা নেই।'

'বউ ঘরে এলেই তখন চাকরির চাড হবে। চাকরি না করলে তাকে সে খাওয়াবে কি ? তার তখন বেড়ে যাবে না দায়িত্ব ?'

বীথির সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো দাদার উপর। জলজ্যান্ত একটা পুরুষ হয়ে এই তার জীবিকার্জনের ব্যবস্থা ! আব এই সব পুরুষই কিনা মেয়েদেব চেয়ে অগ্রসব বলে জাঁক কবে !

বীথি সটান দাদাব ঘবে ঢুকে পডলো। হবেন তখন টেবিলেব উপব পা তুলে দিয়ে সিগবেটে ধোঁয়া নিচ্ছে।

'দাদা, তুমি নাকি বিয়ে করছ ?'

'কাজে-কাজেই,' ধোঁযার সঙ্গে-সঙ্গে কথাটা সে আলগোছে ছেড়ে দিলে।

'কাজে-কাজেই মানে ?' বীথি ঝলমলিযে উঠলো, 'সংসাবে বিযেটাই তোমাব কাজ নাকি ?'

'আপাততো তাই,' হবেনেব গলা তেমনি নির্লিপ্ত, 'চুপচাপ বসে আছি, কাজকর্ম নেই, বিয়েটাই অন্তত কবা যাক।'

'এই কি তোমাব একটা বিযে কবাব সময় নাকি ?' পিছন থেকে বীথি তাব চেযাবেব পিঠটা চেপে ধবলো, 'তুমি আমাব চেযে মোটে চাববছবেব বডো। তুমি তো একটা শিশু।'

হবেন ভ্রূক্ষেপ কবলো না। বিগলিত গলায় বললে, 'এই তো সময়। বিযে কবতে চাওয়াটা কি তবে তুই একটা বার্ধক্যেব লক্ষণ বলে মনে কবিস নাকি ?'

'তা কবি না, কিন্তু এমন যে সেটা একটা অপদার্থ অকর্মণ্যতাব লক্ষণ, তা এই প্রথম টেব পেলুম।'

'তুই আমাকে অপদার্থ বলতে চাস ?'

হবেন ঘাড় ফিরিয়ে ঘুবে বসলো, 'তোব এতো বডো মুখ ? জানিস

ঝিয়ে কবে আমি হাজাব টাকা পণ পাচ্ছি। তুই তা পাবি কোনোদিন বিয়ে কবে?'
'রক্ষে কবো,' বীথি ঘৃণায় জ্বলতে লাগলো, 'পণ নিচ্ছ, সে-কথা বড়ো গলা কবে বলতে তোমাব লজ্জা হচ্ছে না?'
হবেন হাসিব একটা উড়ন্ত ঝাপটা হানলে। বললে, 'তুই এখনো তেমনি সেই সেন্টিমেন্টালই আছিস, খুকি। পণ নেবো না কেন? পণ না নেবো তো ও-মেয়েকে বিয়ে কববাব আমাব কি মাথাব্যথা পড়েছে?'
'তবে বিয়েকে তুমি একটা ব্যবসা ঠাওরেছ?'
'শোন্ খুকি,' হবেনেব মুখ গাম্ভীর্যে নিটোল হয়ে উঠলো, 'যারা বিয়ে কবে, পণটা তাদেব জন্যে তৈবি হয়নি, যাদের বিয়েটা হয়, তাদের জন্যে। বিয়েটা তো আমবা এখানে কবছি না, আমাব বাবা ও মেয়েব বাবা মিলে বিয়েটা এখানে ঘটাচ্ছেন। অফাব, এ্যাকসেপটেন্স আব কনসিডাবেশন —তিনে মিলে অটুট একটি কনট্রাক্ট। যদিও আমবা বলে থাকি, আমাদেব বিয়েটা কনট্রাক্ট নয়, স্যাক্রামেণ্ট।'
'তবু তো এ বিয়ে!' বীথি বাগে নিজেকে দুর্বল বোধ কবতে লাগলো।
'হ্যাঁ, একেই আমবা সামাজিক ভাষায় বিয়ে বলে থাকি বটে। নইলে, চিনি না শুনি না, কোথাকাব কাব একটা মেয়েকে ধবে এনে হৃদয়-মন একসঙ্গে সমর্পণ করে দেবো—টাকা ছাড়া এ দুর্দিনে তুই তা আশা কবতে পাবিস না, খুকি। ইকনমিকসেই পাশ কবতে পাবিনি, কিন্তু ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাই-চ্যাপটাবটা জলেব মতো বুঝেছিলুম। তা ছাড়া—'
বীথি দুই পায়ে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে বইলো।
'তা ছাড়া, যে বিয়ে কবে, পণটা তাবই প্রাপ্য নয়, যে বিয়ে দেয়, তাব উইণ্ডফল।' হবেন সিগবেটে একটা হালকা টান দিলো, 'বাবাকে এ-পর্যন্ত কিছুই তো সাহায্য কবতে পাবলুম না, অন্তত কষ্ট কবে বিয়েটা তাঁকে

করে দিই। একেবারে ছেলে নামের অযোগ্য হয়ে থাকবো, সেটা কি ভালো দেখায় ?'

'থাক, পিতৃভক্তির চূড়ান্ত দেখিয়েছ,' শত্রুতার একটা দূরত্ব রাখবার জন্যে বীথি সরে দাঁড়ালো, 'কিন্তু ঐ টাকাটা তুমি রোজগার করে বাবাকে দিতে পারতে না এনে ?'

'আমি কেন, আমার বাবাও পারতেন না। তাই না আমি এমন একটা সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারছি ? আর,' হরেন মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো, 'হাতের কাছে এমন একটা সহজ রোজগার থাকতে কেন যে সেটাকে পকেটস্থ করা হবে না, তার কোনো যুক্তিই আমি দেখতে পাচ্ছি না। পণ না নিয়ে বিয়ে করলেই কি সে-মেয়ের দাম আমার কাছে চক্ষের নিমেষে হু হু করে বেড়ে যেতো নাকি ?'

'কিন্তু হাজার টাকা কতোক্ষণ ? পেতে পেতেই বাবার ধার শুধতে যাবে মিলিয়ে।' বীথি তার গায়ে যেন একতাল কাদা ছুড়ে মারলো, 'তুমি পুরুষ, পুরুষ হয়ে আর কোনো ভদ্র উপায়ে তুমি বাবার এ ঋণটা শোধ করে দিতে পারতে না ?'

'যে করে হোক, তবু তো পারলুম, আর বরাতজোরে পুরুষ হয়েছি বলেই পারলুম,' হরেনও তার গায়ে এমন কিছু পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করলো না, 'তুই তো তা-ও পারবি না, বোকা মেয়ে। উঠে পড়ে পাশ করা ছাড়া বাবার জন্যে তুই বা কি করতে পারলি ?'

বীথি গম্ভীর হয়ে গেলো। প্রতিজ্ঞায় কপাল উঠলো তার উজ্জ্বল হয়ে। দুর্দমনীয় দাঁড়াবার ভঙ্গিতে এলো একটা নিষ্ঠুর বন্যদীপ্তি। বললে, 'কিন্তু ঘটা করে বিয়ে যে করছ, বউকে খাওয়াবে কি জিগগেস করি ?'

চেয়ার থেকে হরেন যেন মেঝের উপর টুপ করে খসে পড়লো, 'বা রে, আমি খাওয়াতে যাবো কেন ? আমার কি দায় পড়েছে।'

'তোমার নয় তো কার দায় ? নিরীহ একটা মেয়ে ধরে এনে—'

'হলোই বা, তাতে কি,' হরেন অবাক হয়ে বললে, 'সে কে যে তার আমি দায় নিতে যাবো ?'

বীথি তার বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন বিদ্ধ করে দিতে চাইলো, 'সে তোমার বউ না ?'

নির্লজ্জের মতো হরেন উঠলো হেসে, 'সে আমার বউ কোথায় ? সে সমস্ত পরিবারের বধূ। সমস্ত পরিবারের সম্পত্তি। বউ ঘরে এলে চাকরটা তুলে দেবেন বলে মা তো এখন থেকেই জল্পনা শুরু করেছেন। আমি একা তার ভার নিতে যাবো কেন ?'

'তাই বলে তোমার বউকে তুমি খাওয়াবে না ?'

'আমি খাওয়াবার কে ?' সিগরেটের টুকরোটা হরেন দু' আঙুলের চাপে ছাইদানের উপর পিষে ফেললে, 'সে নিজে খেটে খাবে। যতোক্ষণ সে আমার একার নয়, পাঁচজনের, ততোক্ষণ তার উপর আমার একবিন্দু দায়িত্ব নেই।'

'একা নয় মানে ?' বীথি ঝলসে উঠলো, 'বাবা আর একা সব দিক সামলাতে পারবেন নাকি ভেবেছ ? ওকালতি তার নেই বললেই চলে —এই সময় সমস্ত ভার তো তোমাকেই নিতে হবে একলা !' ঘৃণায় সমস্ত মুখ তার শীর্ণ, ধারালো হয়ে এলো, 'পুরুষ বলে তো খুব বুক ফোলাও, কিন্তু একা সামান্য একটা স্ত্রীর ভার নিতে পারবে না, তোমার আত্মহত্যা করা উচিত, দাদা।'

'বিয়েই তো করছি।' হাসতে-হাসতে হরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'কিন্তু, উঃ, একা যদি সেই বিয়েটা করতে পারতুম, বীথি। যদি সত্যি একা হয়ে যেতে পারতুম চারদিকে। তা হলে আর ভাবতুম নাকি কোনো কিছু ?'

দাদা যে সত্যি কি বলছে, বীথি তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো। বিয়ের গন্ধে একেবারে দিগ্বিদিক হারিয়ে ফেললো নাকি? উঃ, ছেলেগুলি কি তাড়াতাড়িই যে বকে যেতে পারে।

দু' পা ঘুরে হরেন আবার তার চেয়ারে এসে বসলো। বললে, 'যদি সত্যি কোনোদিন নিজেকে একা বলে অনুভব করতে পারি, বীথি, সেদিন আমার জীবনে আমি নতুন করে জন্ম পাবো। সেদিন সামান্য একটা স্ত্রীর ভার নিতে আমি ভয় পাবো না।'

বীথি আবার একটা ঝিলিক মারলো, 'সেই সামান্যার প্রতি যে তোমার বড়ো দয়া!'

'নিশ্চয়, সে তো সামান্যই আমাদের সকলকার কাছে, কিন্তু সে যদি আমার একা হতো দেখতিস, দেখতিস সে কখন নিদারুণ অসামান্য হয়ে উঠেছে।'

দাদার আইডিয়েলিজমে বীথি এতোক্ষণে একটু নরম হয়ে এলো। বললে, 'তাই তো আমরা চাই। গলায় গামছা বেঁধে বিয়ে যখন নিতান্ত করবেই, তোমার বউ এসে সংসারের শ্রী ফিরিয়ে দিক। জাগিয়ে দিক তোমার কর্তব্যবুদ্ধি, তোমার দায়িত্বজ্ঞান।' বীথি চেয়ারের দিকে প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগলো, 'একা—একা তুমি তো বটেই। বাবা আর একহাতে কতো কাল পারবেন সংসারের জোয়াল টানতে? এবার থেকে একা তোমাকেই তো সব ঘাড় পেতে নিতে হবে। বিয়ে যখন নিতান্ত করবেই, চাকরিও তবে সেই সঙ্গে একটা যোগাড় করে ফেল।'

হরেন অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। পরে সংক্ষেপে জিগগেস করলে, 'তুই এবার আই-এ দিয়ে এসেছিস না?'

'হ্যাঁ, কে না জানে!'

‘তারপর তুই আবার বি-এ পড়তে যাবি না ?’
‘নিশ্চয়। আর, পাশও করবো একবারে।’
‘কর্, কর্, যতো খুশি তুই পাশ কর্, বীথি,’ হবেন আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো, ‘যতো খুশি তুই পড়, পৃথিবীর সমস্ত বই তুই শেষ করে দে, তবু তুই কিছু বুঝবি না, ঘরের ঐ খুঁটিটার মতোই তুই মূর্খ হয়ে থাকবি চিরকাল। সাধে কি আর লোকে বলে মেয়েরা শত বিদুষী হলেও তাদের কিছু জ্ঞান-গম্যি হয় না ? যা,’ শূন্যে হাতের সে একটা ঝাপটা মারলে, ‘পড়্ গে বসে-বসে—ভালো-ভালো প্যাসেজ মুখস্থ কর্ গিয়ে, খুব কোট্ করতে পারবি—এক্জামিনে কাজে দেবে।’
পকেট থেকে দেশলাই বার করে হবেন একটা সিগরেট ধরালো।

বাবা যে দারিদ্র্যে কতো তলিয়ে গেছেন বীথি সেটা গায়ের উপর স্পর্শের মতো অনুভব করতে পারে। তিনি আজকাল তাকে আর একটাও পড়ার কথা জিগগেস করেন না, সে সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল যেন তিনি হারিয়ে বসেছেন। আই-এ পাশ করে সে বি এ পড়তে যাবে, সেটা যেন ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠায় জানুয়ারির পরে ফেব্রুয়ারির আসার মতো। তার পড়াটা যেন এখন যান্ত্রিকতায় বাঁধা, নেই আর তাতে সেই প্রতিভার মৌলিকতা। যেন সামান্য একটা অভ্যেস, যেমন তার এই বয়েস। সে যেন আর পড়ছে না, তাকে পড়ানো হচ্ছে, না পড়লে তাকে আর এখন মানায় না, আর তার মানে হয় না কোনো। বাবার এই অনুৎসাহ বীথিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলো। শুধু পরীক্ষায় ভালো করে সে আর বাবার মনোমত হতে পারছে না—নিরর্থক কীর্তিটা আর তার প্রতিভূ নয়। নিজের উপর বীথির ধিক্কার জন্মে গেলো।

সত্যি, সে কেন ছেলে হয়ে জন্মালো না? তা হলে সে কতো কাজ করতে পারতো, জীবনকে কতো বিপন্ন করতে পারতো অনায়াসে। দেখাতে পারতো কতো সাহস, সবাইকে দিতে পারতো কতো বড়ো নির্ভর। বীরের মতো বাবার সঙ্গে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াতো পাশাপাশি, দুর্দিনে সংসারের ভোল দিতো ফিরিয়ে। এই কেমন অসহায় আলস্যের মধ্যে বসে আছে, পরিতৃপ্ত শূন্যতায়। তার হাত আছে তবু হাত নেই, পা আছে তবু সে চলতে পারছে না। মেয়ে, সত্যি সে মেয়েই হয়ে রয়েছে আগাগোড়া।

ছেলেদের সঙ্গে তুলনায় অলক্ষ্যে সে তাকে নামিয়ে আনছে বলে বীথি প্রতি রক্তকণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। ঐ তো বাবার ছেলে মূর্তিমান শোভা পাচ্ছে। সংসারের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সামান্য করে আঙুলটি যে তুলতে পারছে না, সমস্ত চিন্তা যে হাওয়ার সঙ্গে ধোঁয়ায় দিচ্ছে উড়িয়ে। বর্ষারাতে দীপালি-উৎসবের মতো যে ক্ষণকালিক একটা বিলাসিতার আয়োজন করেছে—চারদিকের এই শ্মশানের মাঝে শুয়ে ওড়াচ্ছে যে এখন স্বপ্নের ফানুস। মেয়ে হয়ে বীথি কি তারো চেয়ে ছোট?

প্রতিজ্ঞায় সমস্ত ভঙ্গি তার ক্ষুরের প্রান্তের মতো প্রখর হয়ে এলো। কিন্তু কি সে করতে পারে, এখুনি করতে পারে? বাবার মুখে ফিরিয়ে আনতে পারে আবার সে সেই উদ্ধত দীপ্তি, মা'র মুখে সেই উদার স্নিগ্ধতা। সংসারের অনাবাস দিনাতিবাহনের স্রোতে আবার সেই ছোট ছোট পুরোনো কলশব্দ।

হ্যাঁ, সত্যি আর চাওয়া যায় না সংসারের দিকে। আকাশটা এসেছে মুঠোর মতো ছোট হয়ে, ঘরের দেয়ালগুলো যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। বাবা এখন এসে বাসা নিয়েছেন তার নাকের ডগায়, মা নিয়েছেন জিভে। বাবার নাকটা আছে সব সময়েই কুঁচকে, মা'র জিভটা হয়েছে এখন জন্তুর ল্যাজের মতো। ছোট ভাইটা চ্যাডসের সেরে এক পয়সা ঠকে এসেছে বলে মা তার কাঁচা মাথাটা প্রায় চিবিয়ে খাচ্ছেন, তারো চেয়ে ছোট ভাইটা হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে চিমনিটা ভেঙে ফেলেছিলো বলে বাবার সামান্য পিতৃত্বের কথাটা আর মনে ছিলো না। পিঁপড়ের মতো এ পরিবারে তার ভাইবোনগুলি ঝাঁক বেঁধে এসেছে, কিন্তু আশ্চর্য, পিঁপড়ের মতো তারা ক্ষীণজীবী নয়। খুটে-খুটে সারাদিন তারা খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে, যদি খাবার তাকে বলো, সেই দিক থেকে তাদের অধ্যবসায় স্কুলের রচনায় স্থান পাবার মতো। আবার সেই

খাবার ভাগ করে দিতে মা'র অপক্ষপাতিত্বের নমুনা যদি একবার দেখ! দুজনের যখন ভাগে জুটছে না, তখন বাকি তিন জনকেও উপোস করে থাকতে হবে। তোমার যখন দুটো জামা আছে, আর ওর যখন একটা ছেঁড়া, তখন কি তোমার সাধ্য বাড়তি জামাটাকে তুমি কাঁচির অত্যাচার থেকে রক্ষা করো। মিছিমিছি মারামারি করে লাভ নেই, কেননা মাঝপথ থেকে মা আর বাবা যুধ্যমান দুই পক্ষকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন সেই শল্যপর্ব থেকে একেবারে মুষলপর্বে।

আশ্চর্য, এই সংসারেরই নিশ্চিন্ত আবহাওয়ায় বসে বীথি একদিন কবিতা মিলিয়েছিলো। বাবা সে-কথাটা আজকাল একবার ভুলেও জিগগেস করেন না। তাঁর সেই নীরবতাটা বীথি একটা তিরস্কারের মতো অনুভব করে। সত্যি, কবিতা লিখে কি হবে, কবিতা লিখে কি পয়সা পাওয়া যায়?

আর্ট—আর্টের সঙ্গেও টাকার কি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ—শিকড়ের সঙ্গে যেমন শাখার। পকেটে যদি তোমার টাকা না থাকে, বীথিব কেবল এই কথাই বারে-বারে মনে হতে লাগলো, তবে আর্ট তুমি সৃষ্টি কবতে পারো না; যদি তোমার টাকা না থাকে পকেটে, তবে সে-আর্ট তুমি উপভোগও করতে পারো না। যার বিত্ত নেই, তার কবিত্বও নেই।

দাদার উপর পুরুষ হওয়ার জন্যে রাগ বা নিজের উপর মেয়ে হওয়ার জন্যে ধিক্কারের চেয়ে বীথির বাবা-মায়ের উপরই বেশি দুঃখ হতে লাগলো, একান্ত কবে তাঁরা তাদের, এতোগুলি অকর্মণ্য অধম সন্তানের, বাবা-মা হয়েছিলেন বলে। দারিদ্র্য এসে বাবাব সঙ্গে তার সেই অন্তরঙ্গতাটি পর্যন্ত শুষে নিয়েছে: এখন সে আর আগের মতো ক্ষুধাতুর, রিক্ত দুটি হাত নিয়ে বাবার কাছে এগোতে পারে না। তাই সে চুপি-চুপি এসে বসে এখন মা'র পাশটিতে। শোকাকুল স্তব্ধতায় মাকে সে এখন সান্ত্বনা

দেয়, বাজারের ফর্দ নিয়ে আলোচনা করে, নিজের শাড়ি কেটে ছোট ভাই-বোনদের নানা মাপের জামা বানায়, রান্না করা থেকে শুরু করে ঘাটে গিয়ে বাসন মাজতে বসে। শ্বশুর-বাড়িতে ফিরে গিয়ে মেজদির যে ফের শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না তা নিয়ে মা'র সঙ্গে উদ্বেগ বিনিময় করে, বিয়ের পর অন্তত দাদার যদি কাণ্ডজ্ঞান হয় এই বলে মাকে সে আশ্বাস দেয়। এক এক সময় দুই হাতে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে বীথি কানে-কানে বলার মতো করে বলে, 'আরো দুটি বছর মা, তারপরে আর আমাদের ভাবতে হবে না।'

সর্বাণী মেয়েব মুখের থেকে চুলের গুচ্ছগুলি কানের পিঠের দিকে একটি একটি কবে সরিয়ে দিতে-দিতে বলেন, 'উনিও তো সেই কথাই বলছেন, সেই কথা ভেবেই তো আছেন বুক বেঁধে।'

একদিন সর্বাণী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তুই যে কেবল পবীক্ষা খারাপ দিয়েছিস বলছিস, উনি তো দেখি বেজায় ঘাবড়ে গেছেন, কি, ব্যাপার কি, বৃত্তি পাবি না নাকি ?'

বীথি হেসে বললে, 'কষ্টেসৃষ্টে তা হয়তো একটা পাওয়া যাবে, কিন্তু—'

'তবে আবাব কিন্তু কি ?' সর্বাণী উথলে উঠলেন, 'বৃত্তি পেলেই তো হলো।'

'কি হলো ?'

'আবো দুবছব পডবার তো সুবিধে হলো।' সর্বাণী জলেব মতো বললেন, 'আমি ভাবছিলুম, মেয়েদেব বৃত্তি দেয়ার নিয়মটা এবার থেকে উঠে গেলো বুঝি !'

'কেন, উঠতে যাবে কেন ?'

'বললেই হলো,' সর্বাণী চোখের কিনারে তেরছা একটা টান দিলেন, 'বললেই হলো, এতোগুলি টাকা দিয়ে মেয়েরা করে কি ! ভালো কাজে,

বাপ-মায়ের কাজে যে তা লাগতে পারে এ তো সবাই না-ও বিশ্বাস করতে পারে—জানিস না বুঝি টোনার শালির কাণ্ড ?'

'সে আবার কোত্থেকে এলো ?'

'টোনা, শশী-সেরেস্তাদারের ছেলে, যে দিবারাত্রি কেবল ফোঁটা কেটে নামাবলী দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—'

'তার আবার একটা শালি আছে নাকি, মা ?' বীথি হেসে ফেললো, 'কি করলো বেচারি ?'

'সে তোর কাছে বলা যায় না।' সর্বাণী কথাটা চাপা দিতে গেলেন, 'যাক, বৃত্তি যখন পাবিই ভাবছিস, তখন আবার পরীক্ষা খারাপ দিলি কি করে ? ক'টা মেয়ে বৃত্তি পায় জিগগেস করি ? ঐ তো অবনী-ডাক্তারের ছেলে নরেশও এবার পরীক্ষা দিয়েছে—সে বৃত্তি পাবে, তার গুষ্টিতে কেউ পেয়েছে ?'

বীথি হঠাৎ ঔদাস্যে ডুবে গেলো, 'মেয়ে হলে বোধকরি পেতো, মা। আমারও এই মেয়ে-বৃত্তিতে তাই মন উঠছে না একেবারে। ছেলেদের সঙ্গে সমান প্রশ্ন জবাব দেবো, অথচ বৃত্তি নেবার বেলায় আলাদা দল পাকিয়ে দাঁড়াবো মেয়ে হয়ে, সেটাকে এমন কিছু ভালো পরীক্ষা দেয়া বলা চলে না।'

সর্বাণীর মুখের ছোট্ট একটি হা-র মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত মূর্খতা এসে বাসা বাঁধলো।

'মেয়েদের বৃত্তিটা, মা, মাথা গুনে আলাদা করে তেরো জনকে দেয়া হয়,' বীথি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্বাণীকে ধাতস্থ করবার চেষ্টা করলো, 'গেজেটে তুমি যে নম্বরেই গিয়ে দাঁড়াও না কেন, তুমি যদি ঐ ভাগ্যবতী প্রথম তেরোটি মেয়ের মধ্যে চলে আসতে পারো কোনো-রকমে, তা হলেই তুমি বৃত্তি পেয়ে যাবে।' বীথি অনুতপ্তের মতো

বললে, 'ওটাকে শুধু বৃত্তি পাওয়াই বলে মা, পরীক্ষায় ভালো করা বলে না।'

'বৃত্তি পাওয়া হলো, অথচ পরীক্ষায় খারাপ করলি, তবে কি তুই পরীক্ষায় ভালো করবার জন্যে বৃত্তিটা উঠিয়ে দিতে বলিস নাকি?' সর্বাণী যেন একেবারে তেড়ে এলেন।

'তা বলি না, কিন্তু পুরুষদের হাত থেকে সেই সম্মান তো জোর করে কেড়ে নিতে পেলুম না।' বীথি যেন সর্বাঙ্গে একটা কলুষিত অপমান বোধ করতে লাগলো, 'শুধু মেয়ে হয়েছি বলে করুণা করে বৃত্তিটা আমাকে যেন ভিক্ষে দেয়া হলো। সেই জন্যে, বৃত্তি পাবো জেনেও, আমি পুরোপুরি খুশি হতে পারছি না। উঃ, তোমাকে বলবো কি মা, একান্ত করে এই মেয়ে হওয়াব জন্যে সব সময়ে আমাদের এই মেকি মূল্য দেযা—কোনো সভায় হলে: এই, সরে দাঁড়াও, মেয়েবা আসছেন; বাস্-এ-ট্রামে হলে: এই, উঠে দাঁড়াও, ওটা মেয়েদের জায়গা; পরীক্ষায় হলে: এই, সোজা করে দেখ, এটা মেয়েদের কাগজ—উঃ, আমরা কবে যোগ্য হবো, আরো যোগ্য হবো, মিনতি কবে নয়, পবিষ্কাব দাবি করে নেবো আমাদেব নিজেদেব জায়গা। ভিড়ে যাবো, অথচ গায়ে কারো ছোঁয়া লাগলে গায়ে তক্ষুনি চাকা-চাকা ফোস্কা পড়বে, আমাদেব এই নোংবা মেগেলিপনা কবে ঘুচবে? মেয়ে ছেড়ে সত্যি করে আমরা মানুষ হবো কবে?'

বীথি এক নিশ্বাসে এতো কথা অনর্গল বলে যাচ্ছিলো যে মায়ের মুখের দিকে একবারও সে চেয়ে দেখেনি। সে-মুখ কখন পুড়ে ছাই হয়ে অন্ধকারে উড়ে গেছে।

বীথি হঠাৎ তাঁর হাতে একটা ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ কি, তোমার কি হলো, মা?'

সর্বাণী নয়, যেন একটা কাটামুণ্ডু কথা কইলো, 'তুই এ কি বলছিস, খুকি ? তুই ভিড় ঠেলে সভায় যাস নাকি, বাস্-এ চড়িস নাকি একা-একা, কি ভীষণ কথা, আমি গিয়ে এক্ষুনি ওঁকে বলে দিচ্ছি—পড়ে-শুনে তবে তুই কি ছাই মানুষ হতে গেলি ? এর চেয়ে ঘরের মেয়ে, তোর মেয়ে হয়ে থাকাই যে ভালো ছিলো। এই তো টোনার শালি,' সর্বাণী কথাব মাঝখানে আবার একটা বিস্ময়েব ধাক্কায কাটা পড়লেন, 'কি কাণ্ডটাই না কবছে !'

বীথি লজ্জায় একেবাবে চুপসে গেলো, তবু ঠোঁটেব পরিক্ষীণ হাসিটি সে অস্ত যেতে দিলো না, কাগজেব মতো শাদা, পরিচ্ছন্ন গলায় বললে, 'আমার জন্যে তোমাব কিছু ভয নেই, মা। কাণ্ড দূরেব কথা, সামান্য একটা বীজ আমি কবতে পাববো না। এ পর্যন্ত বাড়িব বাইবে আমি পা দিইনি, আমাব পা দুটো মা, খাটেব পায়াব মতো। ভিড কাকে বলে স্বপ্নে পর্যন্ত আমাব কোনো ধাবণা নেই, জেনানা হ্যায বলে বাস্ থামিযে তাতে চড়তে হবে ভাবলে আমাব রীতিমতো লজ্জা কবে। আমাব জন্যে মিছিমিছি কেন ভাবছ ?'

'তবে,' সর্বাণী আবাব ধনুকেব মতো বেঁকে উঠলেন, 'তবে পুরুষদেব সঙ্গে ঠেলাঠেলি কবে এগিযে যাবাব কথা কি বলছিলি ? গাযেব জোবে পাববি নাকি ওদেব সঙ্গে ?'

'তা কেউ-কেউ পাবেও, মা। জামাইবাবু যখন মেজদিকে ঠ্যাঙায, মেজদিও তখন ছেড়ে কথা কয নাকি ?' বীথিব হাসতে পর্যন্ত এখন ইচ্ছে কবছে না, 'আমি গাযেব জোবে না পাবলুম, মা, কিন্তু মাথাব জোবে পাববো না কেন ? তাই বি-এটা আমি আবো ভালো কবে পড়তে চাই—যেখানে মেয়েদেব বলে আলাদা কোনো বৃত্তি দেবাব ব্যবস্থা নেই, যেখানে পুরুষদেব সঙ্গে মেযেদেব উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। সেখানে

আমি একবাব দেখবো তাদেব ছাড়িযে যেতে পাবি কি না, তাদেব যাবা শ্রেষ্ঠ, তাদেব যাবা শিবোমণি।'

'হ্যাঁ, পডবি বই কি,' এতোক্ষণে সর্বাণী যেন আশ্বস্ত হলেন। এলেন এতোক্ষণে মেযেব কাছে ঘনিয়ে, 'হ্যাঁ, বি-এ পাশ না কবলে চলবে কেন?'

'ঐ তো তোমাব গুণধব ছেলে মা, আমাব পূজনীয দাদা,' বীথি দীপ্ত মুখে বললে, 'একটা বিযে কবা ছাডা জীবনে আব কিছু যে কবতে পাবলো না, সামাজিক উপযোগিতায অন্তত তাকে যাবো ছাড়িয়ে। অন্তত তাব চেয়ে আমি দামী হবো।' কথাটা মা সা সাবিক অপভাষায় বুঝতে চাচ্ছেন মনে কবে বীথি রূঢ কণ্ঠে বললে, 'টাকা, টাকা, টাকা বোজগাব কবে এনে দেবো মা, পুরুষপ্রবব আমাব মূর্তিমান দাদা যা পাবলেন না, দবকাব হলে তাঁকেও সস্ত্রীক খেতে দেবো মা, পেট ভবে—আমি একবাব দেখবো, মেয়ে হযেছি বলে একেবাবেই মেয়ে হযে যাইনি।'

'তাই বল্,' সর্বাণী ডগমগ কবে উঠলেন, 'আগে তোব কথা শুনে এমন ভয় পেয়ে গিযেছিলুম। নিশ্চয়, তুইই তো আমাদেব ভবসা, বীথি—নইলে ঐ টোনাব শালি, ছি ছি ছি—তোবই মুখেব দিকে আমবা চেয়ে আছি। সৎ পথে থেকে টাকা বোজগাব কবাব মতো বডো কাজ আব কি আছে?'

পুরুষ হলে শুধু টাকা বোজগাব কবলেই হযতো চলতো, কিন্তু মেযে যখন হযেছে, তখন হায, সৎপথটাও তাকে দেখতে হবে।

অপবিচিত সেই টোনাব শালিব জন্যে বীথিব হঠাৎ মন কেমন কবে উঠলো। বললে 'কিন্তু টোনা না কাব শালিব কথা বলছিলে, মা, সে কি কবেছে?'

'আর বলিস নে ওব কথা,' সর্বাণী সর্বাঙ্গে ছি ছি কবে উঠলেন, 'কাল

যাস আমার সঙ্গে ও-বাড়ি, দেখে আসবি নিজের চোখে। যেমন পাপ করেছিলো, তেমনি এখন তার শাস্তি ভোগ করছে। মেয়েটার হাল যা হয়েছে, যদি দেখিস খুকি, মায়া হবে।'

কিন্তু সর্বাণীর বিশেষ মায়া হচ্ছে বলে বোঝা গেলো না। বরং 'মায়া হবে'-কথাটার মধ্যে একটা 'বেশ হয়েছে'-র ভাব যেন চকিতে উঁকি মেরে গেলো।

কি ভীষণ কাণ্ড না জানি সে একটা করেছে, সেই ভয়ে বীথি কিছু আর জানতে চাইলো না।

'তোর কাছে সেই কথাটা আজ বলবো বলেই এসেছিলুম, তোকে হুঁসিয়ার করে দিতে,' সর্বাণীর গলাটা ধুপ করে নেমে এলো, 'বিয়ে হচ্ছে না বলে মেয়েটাকে বাপ-মা শেষকালে পড়তে দিয়েছিলো ইস্কুলে, টেনেবুনে ক'বছর পড়েওছিলো বুঝি, কিন্তু ও-সব মেয়ের পড়ায় মন বসবে কেন, লেখাপড়া গেলো গোল্লায়, ধুবন্ধর মেয়ে কোন এক ছোকরার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করলেন—কি যে আজকাল সব নতুন-নতুন কথা বার হয়েছে বাপু,' সর্বাণী ছোট একটি টিপ্পনি কাটলেন, 'আমাদের সময় বাংলা ভাষায় অমন একটা শব্দ আছে বলে সাতজন্মে জানতুম না। তা কর্ তো কর্, ছেলেটাকে একেবারে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে গেলো। মুখ ফুটে মেয়ে যে কখনো বিয়ে করতে চায়, এই বাবা প্রথম শুনলুম।

রুদ্ধ একটা নিশ্বাস ছেড়ে বীথি বললে, 'বা, ভালোই তো করলো, বিয়ে হচ্ছিলো না, নিজের বিয়ের একটা ব্যবস্থা করলো। বাপ-মা'র সমস্যাটা এক কথায় মিটিয়ে দিলে।'

'ভালোই করলো?' সর্বাণী সমস্ত গায়ে চিড়বিড় করে উঠলেন, 'কোথাকার কে একটা অচেনা ছেলে, তার সঙ্গে গোত্রে মেলে না,

গণ মেলে না, বিয়ে কববার জন্যে অমনি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো, ভালোই কবলো বলতে চাস ?'

বীথি এবাব নিশ্বাসটা ততো সহজে ছাড়তে পাবলো না। বললে, 'তাবপব কি হলো ?'

'কি আবার হবে ? মাথাব উপবে জলজ্যান্ত মা-বাবা তো বেঁচে আছে ? ছেলেটাকে প্রায় ঘাড় ধবে শহব থেকে বাব কবে দিলো।'

'আব ছেলেটা অমনি হেঁট হয়ে সুড়-সুড় কবে চলে গেলো, মা ?'

'তাই তো হয়েছে মজা,' সর্বাণী গলাটাকে বসালো কবে তুললেন, 'যেই চলে গেছে, মেয়ে অমনি লম্বা বিছানা নিয়েছে। খায় না, দায় না, পড়ে-পড়ে কেবল কাঁদে।'

'কাঁদে ?' বীথিব মেরুদণ্ডেব মধ্য দিয়ে তুঃসহ একটা শিখা উঠে গেলো, 'যে-পুরুষ তাকে নির্লজ্জেব মতো অমন ত্যাগ কবে গেলো, তাব জন্যে সে তাবপব কাঁদতে বসেছে, মা ? আব তোমবা সে-কথা জানতে পাচ্ছ ?'

'জানবো না ? পাপ কখনো চাপা থাকে নাকি ?' সর্বাণী খবখবে গলায় বললেন, 'কাঁদবেই তো, সাবা জীবন কাঁদবে—পাপ কবলে তাব শাস্তি ভোগ কবতে হবে না ?'

'পাপ ?' পা পিছলে বীথি যেন অথই জলে পড়ে গেলো, 'তুমি না বলছিলে সে প্রেম কবেছে ?'

'ও তো পাপই, এ বয়সে ও তো পাপই একশোবাব।'

'এ বয়েসে বিয়েটা তো ওব অনায়াসে হতে পাবতো, মা।'

সর্বাণী কথাটা নিজেব মতো কবে বুঝলেন, বললেন, 'কি কবে হতে পাবতো ? প্রেম কবলেই তো আব হলো না—এক গোত্রে বিয়ে হতে পাবে নাকি কখনো ? আব ওব বিয়ে কোনো দিন হবে ভেবেছিস নাকি ? কেলেঙ্কাবিব একশেষ হয়ে গেলো না ?'

'বিয়ে যখন আর হবেই না বলছ, তখন,' বীথি আবার ভয়ে-ভয়ে বললে, 'সেই ছেলের সঙ্গেই দিয়ে দেয়া হোক না।'

'এখান থেকে সরে গেলে যদি হয়, কিন্তু যাক গে সে-কথা,' সর্বাণী আবার মেয়ের কাছে ঘন হয়ে গুটিয়ে বসলেন, গলা নামিয়ে বললেন, 'বিয়ের আগে সুনাম ও বিয়ের পরে সতীত্ব এই দুটো নিয়েই মেয়ে— এ-কথা কোনোদিন ভুলিস নে, বীথি। দেখলি তো, ও-মেয়েটাও পড়তে গিয়েছিলো, ওকে দিয়েই হয়তো বাপ-মা কতো আশা করেছিলেন।'

'বিয়েই আশা করেছিলো, মা, কিন্তু,' বীথি খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'আমার জন্যে তোমার কিছু ভাবনা নেই, মা, তোমার টোনার সেই শালি আমার মতো বৃত্তি পায়নি।'

সর্বাণী তার দিকে চেয়ে অদ্ভুত করে শব্দহীন হেসে উঠলেন।

'আমার বিয়ের আগেও নেই, পরেও নেই—আমার আবার কি ভয়।'

'তবু, দিন-দিন তুই বড়ো হচ্ছিস, মনে রাখিস—'

'কি করা যাবে মা, মনে না রাখলেও দিন-দিনই আমাকে বড়ো হতে হবে। বড়ো যে হবো সেই তো আমার জোর।'

'তা তো হবি, কিন্তু তোকেও ইস্কুলে-কলেজে পড়তে দিয়েছি, দেখিস, কেউ যেন টুঁ শব্দটি না করতে পারে।'

'সবাই আর তোমার টোনার শালি নয় যে একেবারে পাড়া মাথায় করে ভ্যাবাতে শুরু করবে,' বীথি উদ্ধত দুই কাঁধের উপর চুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলো, 'পৃথিবীতে অনেক বীজাণু আছে মা, ইংরিজিতে তাকে মাইক্রোব বলে—কিন্তু সব মাইক্রোবই ক্ষতিকর নয়, সব মাইক্রোবেই রোগ হয় না, কতোগুলিতে আবার জমির সার হয়, কতোগুলিতে আবার শস্য সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। মেয়েদের মধ্যে কেউ

শুধু 'পাশ করে, কেউ আবার বৃত্তি পায়। অতএব আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মেয়ের গভীর বিদ্যাবত্তায় সর্বাণী আপাদমস্তক অভিভূত হয়ে বসে রইলেন।

হবেন বিয়ে কবে বউ ঘবে আনলো। বীথিব বেজাল্টটা তখনো বেরোয়নি বলে তাকেই নিতে [illegible]া ববণ কবে।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপা[illegible]াব উপব এমন সে একটা মুখ করে বইলো যেন চোখেব উপব সত্য[illegible]ত্য সে একটা ফাঁসি দেখছে। আব হবেনের মুখ গোল, শুকনো একটা ভাতেব গবসেব মতো বিস্বাদ।

মিবকুটে একটুখানি একটা খুকি। এক গলা ঘোমটা। নিশ্বাস নিতে ফুসফুসটা যে সামান্য তুলে ওঠে সেই সম্বন্ধে পযন্ত তাব ভয়। শবীবটা থেকে কোথাও সে উধ্বর্শ্বাসে পালিয়ে যেতে পাবলে যেন বক্ষা পায়। সামান্য দুটো হাত-পা, মুখ আব মাথা নিয়ে সে ভীষণ বিপন্ন হয়ে পড়েছে —এতো ভাব, এতো আবর্জনা সে যে কোথায লুকোবে জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। সে যে মেযে এই লজ্জায তাব প্রায মাবা পডবাব যোগাড।

মা একেবাবে আহ্লাদে ভিজে উঠেছেন, 'কেমন ছযছোট্ট চমৎকাব বউ হযেছে আমাব! যেমন লাজলজ্জা, তেমনি কেমন নবম তবম স্বভাবখানি। আজকালকাব মেয়েগুলোব হায়া আছে, না চেহাবা আছে! কেবল ডঙ্কা মেবে চলা। যতো বযেস বাডে ততো কেবল আঁচল ফুলিযে পালেব নৌকোব মতো পাডি মাব। আমাদেব সময়কাব সেই দু বেড দিযে পুরু কবে শাড়ি পবাব কাযদাটা পযন্ত তাবা মানতে চায না। যেমন চোয়াড়ে হাত-পা, তেমনি মেরুদণ্ডটা হয়েছে ধনুকেব ছিলাব মতো। উচ্চুঙ্গেব মতো কেবল লাফিযে বেডাচ্ছে। এই তো ভালো, কেমন সব সময ঢাকাঢুকি দিয়ে গোলগাল হয়ে চলাফেবা কবা।'

নেপথ্য থেকে মা'ব কথাগুলি আবছা কবে শুনে বীথি বিশীর্ণ হয়ে গেলো। কবে সে আবাব এখান থেকে কলকাতায় যেতে পাববে, অক্ষবেব সেই বিশাল অবণ্যলোকে, যেখানে বইয়েব সংখ্যাব অনুপাতে মানুষেব বয়েস নিতান্ত বাড়ছে না বলে সম্মিলিত হাহাকাব উঠছে, যাব সম্পর্কে এমার্সন একদিন বলেছিলেন : আমাব কাছে, খববদাব, তুমি কোনো বই নিয়ে এসো না, যদি না সেই সঙ্গে আমাব জন্যে তুমি তিন হাজাব বছরের আয়ু আনতে পাবো। বীথিও তেমনি যেতে চায যে বইয়েব সমাবিস্থতায়, যেখানে বযেস বাডছে বলে কোনো ভয় নেই, বয়েস ফুরিযে যাচ্ছে বলে ভয়।

সংসাবে মেয়েদেব মধ্যে বয়েস যাদেব হয়—যেমন তাব এই নূতন বৌদিদিটিব, তাবাই জেনো ভাগ্যবতী, আব বয়েস যাদেব বাড়ে, তারাই হচ্ছে 'প্যাবিয়া'।

বয়েস তোমাব হচ্ছে না বাডছে তা নির্ণয় কববে বিয়ে নামক সেই তাপযন্ত্র। কোনো বকমে তোমাব বিয়ে যদি একটা হয়, তবে মনে কবতে হবে তোমাব বয়েসও হযেছে আব কোনো উপাযে সেটা যদি তোমাব না হয়, তবে মনে কবতে হবে বয়েসটা তোমাব বাডছে বলেই তা হলো না। উঃ, কবে, সে এখান থেকে যেতে পাববে। কিন্তু কোথায়, কোথায় যে সত্যি তাব যাবাব জাযগা আছে তাব সে কোনো পথ দেখতে পেলো না।

বীথিব বেজাল্টটা শেষ পযন্ত বেরুলো—যা ভেবেছিলো, মেয়েদেব মধ্যে বৃত্তি সে একটা পাবে, কিন্তু নাম নেমে গেছে গেজেটেব দ্বিতীয পৃষ্ঠায। তাতে বাবা মা'ব বিশেষ কিছু অবিশ্যি এসে যাচ্ছে না, ববং ঐ টাকাব ভাগ থেকে আবো দু'চাব চাকতি বেশি পাঠাতে পাবলে তাবা খুশি হতেন, কিন্তু নিজেব দুববস্থায় বীথি জীবনে এই প্রথম মুষড়ে গেলো। বুকে একটা তুফান নিয়ে এলো সে এবাব বি এ পডতে।

শুনতে যাতে জাঁকালো শোনায় বাবার কথায় ফিলজফিতে সে অনার্স নিলে।

কিন্তু দু'দণ্ড চুপ করে বসে পড়া করে তার সাধ্য কি। পিছন থেকে মামিমা অমনি তার আঁচল ধরে টানতে শুরু করেছেন।

'তুই কেমনতরো মেয়ে লো বীথি, ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আর তোর চোখের সামনে রেলিঙে শুকোতে-দেয়া তোষকগুলি তুই ঘরে নিতে পারিসনি?'

বীথি অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'পড়ছিলুম, মামিমা।'

'পড়ছিলি বলে পাঁচজনের সংসারে সব সময়ে এমনি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা চলে নাকি?' মামিমা অভিমান করে বলেন, 'পাঁচটা শিখবি বলেই তো পাঁচজনের ঘরে বাপ-মা তোকে থাকতে দিয়েছে।'

বীথি নিঃশব্দে এতটা আর্তনাদ করে ওঠে সত্যি যদি একজনের হয়ে থাকতে পারতুম একলা। তা হলে, আর যাই হোক, পড়াটা অন্তত তৈরি করতে আমার বাধতো না।

আরেকদিনের কথা ধরো। এক বসায় কতোক্ষণ তোমার পড়া সম্ভব।

'তুই কেমনধারা মেয়ে লো বীথি,' মামিমা কোত্থেকে আবার তেড়ে আসেন, 'তোর সামনে ছেলে দুটো এমন খাওয়াখাওয়ি করছে, পা দিয়ে ফুটবল খেলে তুলোর খরগোসটা অমন ছিঁড়ে ফেললো, আর তুই কিছু দেখতে পাস না?'

বইর উপর ঝুঁকে পড়ে বীথি বলে, 'পড়ছিলুম, মামিমা।'

'এ তোর কোন কায়দায় পড়া? চোখের ওপর শুম্ভনিশুম্ভর থাক যাক যুদ্ধ চলেছে, আর তুই হেঁট হয়ে বসে দিব্যি পড়া চালাচ্ছিস?'

'ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। ওদের যুদ্ধ থামাতে গিয়ে যে এনার্জিটা আমার খরচ হতো, তা দিয়ে আরো দু'পৃষ্ঠা আমি পড়ে ফেলতে পারতুম।'

'তার জন্যে এমন একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে, তুই সামনে থেকেও হাত দিবিনে?' মামিমা বাঁকা করে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, 'এতো পর-পর ভাব কেন, পরের বাড়ি, পরের ঘর, পরের ছেলে-মেয়ে—ভবিষ্যতে তোর উপায় কি হবে? এই বয়সেই এতো স্বার্থপর হতে শিখলি কি করে?'

উঃ, করে সে নিজের বলে একখানা ঘর পাবে! ছোট, নরম, উষ্ণ একখানি ঘর। তার আত্মার ঘনতা দিয়ে তৈরি। যেখানে চারপাশের দেয়ালগুলি তার স্তব্ধতা দিয়ে ভরা।

তার পড়ার জন্যে খুঁজে বেড়ায় সে একটি নিভৃতি, ঐ জানলাটার ধারে, সিঁড়ির নিচে, আঁচলের তলায় বই লুকিয়ে নিয়ে কোনো-কোনো দিন বা বাথরুমে!

এতোতেও নিষ্কৃতি নেই, এই অপ্রতিরোধ নিষ্ক্রিয়তায়। তাকে এক্ষুনি গিয়ে পায়েস জ্বাল দিতে হবে।

'যা তো বীথি, আমি খোকাটাকে ঘুম পাড়িয়ে যাচ্ছি, তুই ততোক্ষণ পায়েসের কড়ায় গিয়ে হাতাটা নাড় তো বসে বসে—দেখিস, ধরে যায় না যেন, বেশ তলা ঘেঁষে নাড়িস যেন হাতাটা।'

'আমি এখন পড়ছি, মামিমা।'

'কতোক্ষণ আর লাগবে, পড়া তো তোর আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না,' মামিমা তার মর্মমূলে চিমটি কাটেন, 'ওদিকে তোর মা তো দেখি কতো ঠাট করে চিঠি লেখে, মেয়ে নাকি একজামিন-দেয়া হাতে উনুন থেকে ডেকচি নামিয়ে ফ্যান গালতে পারে, দু'হাতে বাসনের পাঁজা নিয়ে একাই যেতে পারে ঘাটলায়।'

'মা তোমাদের এই কথাও লিখেছেন নাকি?'

বীথি অগত্যা আর বই নিয়ে বসতে পারে না, পায়েস নাড়তে নিচে চলে যায়।

কিম্বা :

'তোর মামাবাবুর মোজাব এই গর্ত দুটো বিফু কবে দে তো।'

যখন ধবো বীথি বের্গসঁব ক্রিয়েটিভ এভোলিউশান পডছে।

কিম্বা :

'আচাব কববো, বীথি, চালুনিতে কবে আমাব সঙ্গে তেঁতুল গুলবি আয়।'

যখন ধবো সে পডছিলো হোয়াইটহেড্-এব বিলিজান ইন দি মেকিং।

বাবে-বাবে ছন্দ ভেঙে-ভেঙে তাকে উঠে পডতে হয়। আবাব যখন গিযে সে ফেব বই নিয়ে বসে, তখন সেই সুব আব সহজে জোডা লাগতে চায় না। অমনি আবাব ·

'বাবাঃ, সাবা দিন কেবল বই মুখে কবে বসে আছিস, আমাব হাত জোডা, এ বেলাব কুটনোটা একটু কুটে দে না বসে-বসে।'

'আমি এই যে, একটুখানি এখন পডতে বসেছিলুম, মামিমা।'

'কতোক্ষণ আব লাগবে। ততোক্ষণে তোব বই থেকে অক্ষবগুলি আব উডে যাবে না।'

বলো, কি কবে তবে সে আব পবীক্ষায ভালো কবতে পাবে ?

অথচ টুকু-দাব কত সুবিধে। সামান্য একটা বাজাব পযন্ত টুকু-দাব কবতে হয় না। চা খেযে পেয়ালাটা সে যেখানে খুশি ফেলে বেখে গেলো কে যে সেটা কুডিযে নিয়ে ধুযে তুলে বাখবে তাব খেয়াল নেই। তাব স্নানেব শাডিটা পযন্ত বীথিকে নিজ হাতে কেচে বাবান্দাব তাবে মেলে দিযে আসতে হয, টুকু দাব কাপডটা যে কি কবে ফেব শুকনো মসমসে হয়ে দেখা দেয, একবাব তাকে তা জিগগেসও কবতে হয না। বৃষ্টিতে তোষক ভিজছে বলে তো তাব ঘুম নেই।

টুকু-দা অবিশ্যি তা মানতে চায় না। বলে, 'আমাদেব কতো কাজ। আমাদেব জীবনে মোহনবাগান নামে একটা প্রচণ্ড সমস্যা আছে,

আড্ডায় গিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের রাজা-উজির মারতে হয়, তাশ পিটতে হয় বাজি রেখে, খবরের কাগজ বলে বিংশ শতাব্দীর একটা ব্যাধিতে আমরা দিবারাত্র ভুগছি। তোমাদের কি ? দুটো কুটনো কোটো, নয়তো একটু উল বোনো—পড়তে-পড়তে এই তো তোমাদের কাজ।'

'তোমাদের কাজটা পড়ার পরে, আর আমাদের কাজটা—ঐ যা বললে —পড়তে-পড়তে। এই যা তফাত।' বীথি বিরক্ত মুখে বলে, 'বারে-বারে যদি উঠে পড়তে হয়, তবে আর পড়বো কখন ?'

'আমাদের ঠিক উলটো, কেবল যদি পড়তেই হয়, তো উঠবো কখন ?'

কিন্তু এ সবের চেয়েও বীথির জীবনে ঘোরতরো আরেকটা সমস্যা ছিলো। বিনায়কবাবু করুণ করে লিখে পাঠিয়েছেন : কোনোরকমে আরো ক'টা টাকা সে বেশি পাঠাতে পারে কিনা।

বীথি তার পৃথিবীব্যাপী বিশাল অসহায়তায় নিঝুম হয়ে গেলো।

না, না, সে পারে, এখুনি পারে—আনন্দে সে ছিঁড়ে পড়তে লাগলো, উঃ, তা কতো সহজ—এতোক্ষণে, কেন সে এর আগে ভেবে দেখেনি —সত্যি, না, মেয়েদের বাস্‌এ করে সে আর কলেজ যাবে না। নিটোল চার টাকা তার বেচে যাবে। হাত-খরচের আরো এক টাকা কমিয়ে মোট পাচ টাকা সে পাঠিয়ে দিতে পারবে বাবাকে। পাঁচ টাকা—পাঁচ টাকায় হয়তো বাবার একটা ছাতি, মা'র একজোড়া শাঁখা, ছোট ভাই-বোনগুলির এক বাটি করে দুধ, আর দাদার হয়তো এক প্যাকেট অন্তত সিগরেট হতে পারবে—পাঁচ টাকাই বা কম কিসে ?

এবার আর ক্ষেত্রবাবুর আপত্তি টিকলো না।

বিনায়কবাবু আমতা-আমতা করে লিখলেন বাড়ির এতো সামনে কলেজ, চোখ বুজেই চলে যাওয়া যায় দু মিনিটে। সামান্য এটুকু রাস্তার জন্যে মেয়ের হাওয়া-গাড়ি চড়ার বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেবার আর তাঁর

অবস্থা নেই—আজকালকার দিনে এক একটা টাকা একএক বছরের আয়ুর সমান। তা ছাড়া, বীথি এখন বড়ো হয়েছে, ক্রমশই বড়ো হচ্ছে, অনায়াসে সে এখন পায়ে হেঁটে রাস্তাটা পার হয়ে যেতে পারবে।

ক্ষেত্রবাবু লাগামে তাই ঢিল দিলেন, কিন্তু তাঁর মুখের চেহারাটা সিদ্ধ, ছোলা একটা আলুর মতো গোল হয়ে রইলো।

ভয় নেই, সে-মুখে বীথি এক্ষুনি হাসির নুন ছিটিয়ে দেবে। পাশের বাড়ির জমিদারের ছেলের বউটি তার কাছে বিকেল বিকেল ইংরিজি পড়বার বায়না ধরেছে, তার জলখাবারের জন্যে পনেরোটি করে টাকা দিতে সে রাজি। সে যখন এখন থেকে কলেজেই যেতে পারবে পায়ে হেঁটে, তখন বউটির বাড়িতে যেতে দিতে মামাবাবু হয়তো নাকটা তাঁর ত্রিশূল করে তুলবেন না। পনেরোটি টাকা যদি সে পায়, তার থেকে দশটা টাকা সে মামিমার হাতে ধরে দেবে—হায়, তারই জলখাবারের জন্যে। আর বাকি পাচ টাকা জড়ো হবে এসে বাবার তহবিলে। তার স্বাধীনতার ভারে দাঁড়িপাল্লা সে দু'দিক থেকে সমান করে তুলবে।

এতোদিন ধরে তার বাস্‌এ চড়ে কলেজ যাওয়াটা কিনা তারই একটা খেলো বিলাসিতা ছিলো, বাবা ও মামার এবং তাদের নেপথ্যে সমস্ত সমাজের বিলাসিতা ছিলো না। আজ দারিদ্র্য এসে সেই বিলাসিতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। আজ আর সেই বিলাসিতার খরচ পোষাচ্ছে না। সত্যি, এতোদিনে তবে সে বড়ো হয়ে উঠলো। কি সাঙ্ঘাতিক কথা, এতোদিনে সে বড়ো হয়ে উঠতে পারলো সত্যি-সত্যি। তার সামান্য বড়ো হওয়ার যে এতো মূল্য ছিলো, এতো মহিমা, বীথি এর আগে এতো স্পষ্ট করে কোনোদিন যেন বুঝতে পারেনি।

সামান্য শারীরিকতার ঊর্ধ্বে কোনো মেয়ে আবার কোনো কালে বড়ো হতে পারে নাকি?

মা ওদিকে আবার একটি ল্যাজ জুড়ে দিয়েছেন, 'তুই এবার থেকে পায়ে হেঁটে কলেজ করবি, দেখিস, খুব হুঁসিয়ার খুকি, কেউ যেন কোনোদিন টুঁ-টি পর্যন্ত করতে না পায়।'

ঘাড়ের উপর একটা গাড়ি এসে পড়লেও গায়ে তার কাপড়-চোপড় যেন বেশ গোছালো থাকে, কেউ পিছন থেকে একটা ছুরি নিয়ে তাড়া করলেও যেন সে নির্লজ্জের মতো না দৌড়োয়, জলজ্যান্ত দিনের আলোয় আকাশে একটা ধূমকেতু উঠলেও সে যেন সেদিকে চক্ষুস্ফুট না করে।

বীথিকে সে সব কথা কিছু বলে দিতে হবে না।

তারপর সত্যি-সত্যি সে একদিন রাস্তায় পা দিলো—স্বপ্নে-দেখা কলকাতার সেই রাস্তায়। মেয়ে দেখাবার সময় মেয়েরা সব সাজে জানতো, বীথিও তেমনি রাস্তায় বেরুবার আগে সাজলো, সমান সজ্ঞানতায়। মেয়ে দেখাবার সময় মেয়েদের সাজ, যাতে তারা উদ্ঘাটিত হতে পারে যতো তাদের শারীরিক সমৃদ্ধিতে: বীথির এখনকার সাজ, যতো সে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে তার এই ভারবহনের লজ্জায়। যাতে সে কণিকতমো কারুর চোখে না পড়তে পারে, চোখে পড়লেও একটা বস্তু হিসেবে, মেয়ে হিসেবে যেন নয়। শাড়িটা শুধু শাড়ি না হয়ে একটা মশারি হতে পারলে যেন সে রক্ষা পেতো। স্যাণ্ডেলের ফাঁকে পায়ের আঙুলগুলো যে চোখা-চোখা উঁকি মেরে থাকে, সে যেন একটা কুৎসিত কৌতূহলিতা। হাতে দস্তানা পরার নিয়মটা বাঙালী মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত হয়নি কেন? তবু ভাগ্যিস মাথায় একটা ঘোমটার মতো করে সে তার ঘাড়টা ঢাকতে পেরেছে।

তবু রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে সে তার দুই পায়ে।

রাস্তা তো নয়, গুলি-পাকানো প্রকাণ্ড একটা ফিতে—পায়ের সঙ্গে ক্রমাগতই যাচ্ছে জড়িয়ে। মনে হচ্ছে এই বুঝি সে হোঁচট খেয়ে পড়বে,

এই বুঝি শাড়িটা এক ইঞ্চি কোথায় ফসকে গেলো। এই বুঝি কেউ চেয়ে রয়েছে তার দিকে, হায়, তার সুনাম বোধ করি আর রইলো না। কি মাপে যে ধাপ ফেলতে হবে সেইটেই তার কাছে একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। তাই প্রতি পদে 'ধরণী, দ্বিধা হও,' 'ধরণী দ্বিধা হও' বলতে-বলতে সে অগ্রসর হয়। তার জন্যে পৃথিবীতে আর এক ফোঁটা বাতাস নেই, আপাদমস্তক সে অনড় একটা পাথর হয়ে উঠেছে। সে চলছে না, নিজেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। উঃ, কতোক্ষণে সে কলেজে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে? দু' মিনিটের রাস্তা, কিন্তু লাগছে তার এক যুগ।

তার মতো আরো দু'চারটি মেয়ে পায়ে হেঁটে কলেজ করছে। এখানে-সেখানে আরো অনেককে ছিটকে পড়তে দেখা যাচ্ছে। বীথির একএক সময় জিগগেস করতে ইচ্ছে হয়' সবারই কি তারি মতন স্বাধীনতা? এ স্বাধীনতা কি তারা নিজের জোরে অর্জন করেছে, না অবস্থার দুর্বলতায়? মোটরে চড়তে পারলে কি তারা আর বাস্-এ চড়তো। মাস-মাস বাস্-এর ভাড়া দিতে পারলে তারা কি কখনো নেমে আসতো রাস্তায়?

টুকু একদিন বললে, 'দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

প্রস্তাবটাকে বীথি বিশেষ আমোল দিতে চাইলো না। হাসিমুখে বললে, 'তোমার কাছ থেকে সাহায্য নেবো, সেটা তো আমার অগৌরবের কথা, টুকু-দা।'

'আমার সাহায্য নয়, বীথি, এবার থেকে সাহচর্য। গাইড নয়, সঙ্গী। দাঁড়াও,' টুকু ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আমারও ও-দিকে একটু দরকার আছে।'

আপত্তি করবার কোনো মানে হয় না। কিন্তু টুকু দা সঙ্গে থাকলে রীতিমতো তাকে কথা বলতে হয়, দাঁত দেখিয়ে হেসে উঠতে হয় মাঝে-মাঝে। সেই দিন এঁকে-বেঁকে একটা সাইকেল তার গায়ের উপর প্রায় এসে পড়ছিলো বলে টুকু দা খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলেছিলো। কে

যে কখন কি দেখে ফেলে কোথা থেকে টুঁ ছেড়ে হুঁ করে ওঠে, সেই ভয়েই বীথি মিইয়ে থাকে। টুকু-দা যে তার দাদা, বাইরে থেকে এ-কথা কারুর জানবার কথা নয়।

কোন মেয়ে কখন যে কি দোষ করে বসে তাই দেখবার জন্যে সমস্ত পৃথিবী ঘরে-বাইরে উৎসুক হয়ে আছে, এবং বলা বাহুল্য, তার মধ্যে মেয়েরাই হচ্ছে বেশি—মেয়েদের শত্রু এই মেয়েরাই।

'আজ কার সঙ্গে আসছিলি রে রাস্তা দিয়ে?' তার ক্লাশের একটি মেয়ে ইশারায় একেবারে কিলবিল করে ওঠে, 'হেসে-ঢঙে গড়িয়ে পড়ছিলি যে রাস্তার ওপর?' তারপর গলাটা তার আঠার মতো চটচটে হয়ে ওঠে, 'এতো তোদের কি হাসির কথা লো বীথি, আমায় বলবিনে?'

কথাটার উত্তর দিতে পর্যন্ত বীথি ঘৃণা বোধ করে।

আপ্রাণ কৌশল করে বীথি এড়িয়ে চলে টুকু-দার এই একসঙ্গে যাওয়ার মুহূর্তটিকে। সংসারে তার কেউ সঙ্গী নেই, সে একা। যে একা থাকতে পারে, জীবনে সে কোনোদিন খারাপ হতে পারে না।

মেয়েরা যাকে খারাপ হওয়া বলে, তাই মেয়েদের খারাপ হওয়া। সমস্ত মেয়ের মধ্যে তার মা রয়েছে বসে।

কিন্তু টুকু-দার চোখে ধুলো দেয় তার সাধ্য কি।

বড়ো বড়ো পা ফেলে টুকু-দা কখন আবার তার পিছু নেয়। চেঁচিয়ে ওঠে গলা ছেড়ে, 'দাঁড়াও বীথি, তোমাদের কলেজটা এখুনি একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যাচ্ছে না।' তারপর সামনে এসে দম নিয়ে বলে, 'তোমাকে দেখে ক্রমে ক্রমে আশা হচ্ছে, বীথি, ব্যাঙের থেকে হরিণে প্রমোশান পেয়েছ। আগে আগে যখন যেতে, যেন বুড়ির মতো গঙ্গাস্নানে যাচ্ছ, এখন এমন জোরে পা চালিয়েছ, যেন পেছন থেকে একটা বুনো মোষ তোমাকে তাড়া করেছে।'

বীথি তারপর টুকুর পায়ের সঙ্গে ধাপ মেলাতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু ঠোঁট দুটো জুড়ে রাখা ভালো কথা, সম্ভব হলে নাকের গর্ত দুটোও সে বন্ধ করে রাখতো।

বাইরে এসে সামান্য তার দাদার ছোট বোন হওয়াতেও বারণ।

একদিন টুকু-দা, কলেজ থেকে বাড়ি ফেরবার সময়, তাকে পিছন থেকে ধরে ফেললে। আকস্মিক তার নাম ধরে কে ডাকছে শুনে বীথি এমন চমকে উঠেছিলো, যেন বনের মাঝে কোথায় একটা বাঘ উঠেছে হুঙ্কার দিয়ে!

'ও! তুমি? টুকু-দা?' কিন্তু কথাটা সে উচ্চারণ করতে পারলো না।

'এতো শিগগির তোমাদের ছুটি হয়ে গেলো?' ভুরু তুলে টুকু অবাক হবার ভান করলে, 'মেয়ে-কলেজে পড়াশুনো কিছু তা হলে হয় না বলো?'

'মাঝে-মাঝে হয় বৈকি, ছুটিও হয়।' কথাটা এমন নয় সামান্য একটা ঘাড় হেলিয়ে শেষ করে দেয়া যায়, তাই বীথি বললে, 'আজকাল তো আর বাস-এর প্রত্যাশী নই যে কতোক্ষণে বাস বেরুবে তার আশায় হাঁ করে থাকবো। তাই আগেই নিজে বেরিয়ে পড়েছি।'

'তার তো কিছু নমুনা দেখছি না,' টুকু তার সঙ্গে দু' পা এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, 'ফিরে চলেছ তো দেখছি বাড়ির দিকে, তোমার ইঁদুরের গর্তে।'

বীথি দুই পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, 'তবে আবার কোথায় যাবো?'

'না, কোথায় আবার যাবে! কাঁটা শত ঘুরিয়ে দিলেও যেমন তা ফের ঠিক উত্তরেই মুখ করে দাঁড়ায়, তেমনি যতোই কেননা তোমাদের পথ দেয়া হোক, তোমরা পা বাড়িয়ে আছো সেই বাড়ির দিকে। বাড়িই তোমাদের ধর্ম, বাড়িই তোমাদের মোক্ষ। হোম, সুইট হোম।'

বীথি নিষ্ঠুর গলায় বললে, 'তবে তুমি কি বলতে চাও?'

'বলতে চাই এতো সকাল-সকাল তোমাদের আজ ছুটি হয়ে গেলো, দুপুরের রোদে মিঠে একটি শীতের আমেজ এসেছে, চলো, কোথাও তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।' টুকুর দুই চোখে আকাশের সমস্ত আলো যেন ঝলমল করে উঠলো, 'বিশেষ কোথাও যেতে না চাও, সিনেমায় কি মিউজিয়মে চলো, ট্র্যামএ চড়ে কলকাতা কর্পোরেশান ছাড়িয়ে সটান বেহালায় চলে যাই, আশে-পাশে দুটো গ্রাম দেখে আসি। হায়, তুমি এখনো কলকাতাই দেখলে না, তোমার আবার গ্রাম দেখতে ইচ্ছে হবে।'

পৃথিবী যেন রসাতলে যাচ্ছে এমন একখানা নিশ্ছিদ্র মুখ করে বীথি বললে, 'তুমি কি বলছ যা-তা?' তারপর সামনের দিকে গট-গট করে দু'পা সে এগিয়ে গেলো, 'গ্রাম আমি যথেষ্ট দেখেছি, সমস্ত জীবন কেবল এই গ্রামই দেখলুম।'

'কিন্তু শহর, শহর তো তুমি দেখনি।' টুকু আবার দুই চোখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, 'বেশ, শহরই তুমি দেখবে চলো, বীথি। কলকাতা—এই আমাদের রাজধানী। শহরের মাঝখানে এতো বড়ো একটা মাঠ, তার চৌরঙ্গি—হায়, মধ্যরাত্রের চৌরঙ্গি তো তুমি ইহজীবনেও দেখতে পাবে না।'

'তুমিও তো তেমনি দেখতে পাবে না—কতো কিছু দেখতে পাবে না।' বীথি আরো জোরে পা চালালো।

'না, তুমি চলো,' কণ্ঠস্বরে টুকু আবার তাকে আকর্ষণ করলে, 'বাড়িতে কেউ যদি কিছু জিগগেস করে, আর সত্যি বলতে যদি ভালোবাসো, তো বলবে, টুকু দার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলুম।'

'কিন্তু, তোমার আস্পর্ধাকে বলিহারি,' বীথি বিরক্তিতে ঝাজিয়ে উঠলো, 'তোমার সঙ্গে যাবার আমার কি হয়েছে।'

'বা, আমাব সঙ্গে যাবে বলেই তো বলছি। আ-মা-ব সঙ্গে যেতে তোমাব কি দোষ।'

'আব সত্যি বলতেই যদি আমি ভালোবাসি—' নিজে না গিয়ে বাড়িটা হেঁটে কাছে এসে পড়লে যে বীথি বাঁচে, 'তবে আমি একদিন নিজেই বেড়িয়ে আসতে পাববো।'

কিন্তু টুকু-দাব আস্পর্ধাব সীমাটা সেইখানেই শেষ হয়ে যায়নি।

আবেকদিন, একসঙ্গে কলেজ যাবাব সময়, টুকু হঠাৎ কাকে দেখে পেভমেন্টেব উপবে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'তোমাব সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দি,' ঈশ্বব জানেন টুকু বাস্তাব মাঝখানে কাব একটা হাত চেপে ধবলো, 'এ হচ্ছে আমাব বন্ধু সমবেশ মজুমদাব, খেলাব মাঠে তো যাও না, গেলে নাম শুনতে—আব এ হচ্ছে আমাব বোন বীথি সেন, গেজেটেব পৃষ্ঠা যদি কোনোদিন ওলটাও—'

'ও! আপনি?' সমবেশ দুই হাত তুলে বীথিকে সস্মিত নমস্কাব কবলে। তাব চেয়ে একটা কুকুবে কামড়ে দিলে বীথি খুশি হতো। এমন একটা চেহাবা কবে সে দাঁড়িয়ে বইলো যেন পানোন্মত্ত বাজসভায় তকে বন্দিনী কবে ধবে আনা হয়েছে। পাতাল-প্রবেশেব আগে সীতা এব চেয়ে বেশি অপমানিত বোধ কবেছিলো কিনা সন্দেহ।

সামান্য একটা নমস্কাব কবা দূবেব কথা, বীথি চোখেব পাতা দুটো পর্যন্ত মেলেনি। জলজ্যান্ত অহল্যা যে কি কবে একদিন দেখতে-দেখতে পাথব হয়ে গিয়েছিলো, সেটা সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পাবে। চাণক্য শ্লোকে, এমন বিপদে পড়লে, কতো গজ দূবে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাব ব্যবস্থা নেই, কিন্তু বীথি সোজা একটা লাফ দিয়ে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালো সেটা তাদেব কলেজ।

সমস্তটা দিন বাগে সে কালো হয়ে বইলো। বাড়ি ফিবে গিয়ে কতোক্ষণে

সে টুকু-দাকে নখে-দাঁতে টুকরো-টুকরো করে দেবে তারই লাগলো মুহূর্ত গুনতে।

'এ কি তোমার অভদ্র ব্যবহার?' ফাঁকা একটা জায়গা বাছবার পর্যন্ত সে চেষ্টা করলো না, কথাগুলি অর্জুনের বাণের মতো সে টুকুর উপর ছিটিয়ে দিতে লাগলো, 'চিনি না শুনি না, রাস্তার মাঝখানে কোত্থেকে একটা লোক ধরে এনে আমার সঙ্গে তুমি আলাপ করিয়ে দেবে?'

টুকু হাসিমুখে বললে, 'যাকে তুমি একেবারেই চেনো না, তার সঙ্গেই তো তোমার আলাপ করিয়ে দেবার কথা ওঠে। যদি তুমি চিনতে, তা হলে তো তুমি নিজেই আলাপ করতে পারতে অনায়াসে। আমাকে আর লাগতো কোথায়?'

বীথি রাগে একেবারে শিখায়িত হয়ে উঠলো, 'আমি যাবো আলাপ করতে, রাস্তার মাঝখানে?'

'গেলেই বা। পৃথিবীতে ঘরই বেশি নয় বীথি, রাস্তাই বেশি।' টুকু নির্লিপ্ততায় গলে গেলো, 'সমরের সঙ্গে আলাপ থাকাটা একটা ভাগ্য। ভালো একজন স্পোর্টস্‌ম্যান, এবং ভালো একজন স্পোর্টস্‌ম্যান বলে ভালো চাকরি করে, সেদিন কোন একটা পেট মোটা মাড়োয়ারি কোন একটা কলেজের মেয়েকে ফুলের তোড়া প্রেজেণ্ট দিতে চেয়েছিলো বলে সে তাকে তুলো ধুনে দিয়েছে —'

'কিন্তু,' বীথির গলাটা টলতে-টলতে খাদে পড়ে গেলো, 'সে তো তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো।'

'বয়সে বড়ো, কি করে বুঝলে?'

'গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারি।'

'এমন বুঝলে যেন বাঘ একটা তোমাকে খেতে এসেছে!' টুকুর গলাটা ঈষৎ ধারালো হয়ে উঠলো, 'আমার চেয়ে বয়েসে বড়ো বলে বুঝি সে আর

আমার বন্ধু হতে পারে না ? মেয়েদেব দেশে তেমন বুঝি কোনো নিয়ম নেই ? যাবা তাদের বয়েসে ছোট, তাদেব সঙ্গেই বুঝি তাবা নিশ্চিন্তে আলাপ কবতে পাবে ? আব সময়েব সিঁড়িতে যে-ই দু'এক ধাপ এগিয়ে গেলো, অমনি তাব সঙ্গে মহাভাবত শুদ্ধ বেখে আব কোনো সম্পর্ক বাখা চলে না, না ? তখন তাব হয় দাদা, নয় কাকা, কিম্বা বড়ো জোব মামা হয়ে ওঠা চাই—কি বলো ?'

মামিমা কাছেই কোথায় ছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন, 'কি হলো, কার কথা বলছিস ?'

'আমাদেব সমব, মা, সেই তোমাব মর্চে-ধবা লোহাব সিন্দুকেব ডালাটা যে এক টানে সেদিন খুলে দিযে গেলো।' টুকু বীথিব দিকে একবাবও চেয়ে দেখলো না, 'তাব সঙ্গে বাস্তায আজ আমাদেব দেখা, বীথিব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিতে গেলুম, তায় বীথি এমন এক চোঁচা ছুট দিলে যে পাছে একটা গাড়ি চাপা পড়ে সেই ভযে আমাকেও প্রায পিছু ছুটতে হলো। তুমি আবাব ভদ্রতাব কথা বলো, বীথি ?' বীথিব মাথাটা এক কোপে না কেটে ফেলে সে কুচি-কুচি কবতে লাগলো, 'যে তোমাকে নমস্কাব কবলো, তাব তুমি নমস্কাবটা পর্যন্ত ফিবিয়ে দিলে না।'

মামিমা প্রশান্ত, উদাব গলায বললেন, 'আমাদেব সমবেব কথা বলছিস ? বা, সে তো আমাদেব বাড়ি কতো আসে, খুব ভালো ছেলে, সেদিন আমাব হাতে এক বৈঠকে সতেবোটা আম খেযে গেলো। বা, তাব সঙ্গে আলাপ কবতে কি দোষ।' মামিমাব গলায এতোটুকু খোঁচ নেই, 'সমবেব কাছে আবাব তোব লজ্জা কিসেব ?'

বেখাহীন একটা আযনাব মতো বীথি তাব মামিমাব মুখেব দিকে চেয়ে বইলো। সে কি দাঁড়িয়ে আছে না বসে আছে, স্পষ্ট কিছু সে ধাবণা কবতে পাবলো না।

মামিমা আজকাল তার উপর ভারি সদাশয়, ভীষণ গদ্গদ—পাশের বাড়িতে টিউসানিটা সে কেন করছে মামিমা তা বোধহয় জানতে পেরেছেন।

তারপর সেদিন কলেজ থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠছে, মাঝপথে—পৃথিবীতে আর লোক ছিলো না—সমরেশের সঙ্গে দেখা। তরতরিয়ে সে নেমে আসছিলো, বীথিকে দেখে সমস্ত উপস্থিতেতে নিমেষে সে সন্ত্রাস্ত হয়ে দাঁড়ালো। গলার আওয়াজ না পেয়েও বীথি ঠিক বুঝতে পারলো, তার রক্তের মাঝে বুঝতে পারলো, এ সমরেশ ছাড়া আর কেউ নয়।

অবান্তর প্রশ্ন, তবু সমরেশ কথা না বলে পারলো না, 'এই বুঝি আসছেন কলেজ থেকে?'

অবান্তর উত্তর, তবুও পাশের দেয়ালের সঙ্গে শাদা হয়ে মিশে যেতে-যেতে বীথি বললে, 'হ্যা।'

'বাবাঃ, এতো বই, সমস্ত লাইব্রেরিটা যে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কলেজে?' সমরেশ দিব্যি বিস্ময়ে হেসে উঠলো।

এমন মুশকিল, সে হাসির উত্তরে বীথিকেও চিবুকের উপর ছোট্ট টলটলে একটি টোল ফেলে হেসে উঠতে হলো।

কিন্তু, সর্বনাশ, উপরে, সিঁড়ির মুখে মামাবাবুর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শত চক্ষু মেলে তিনি তার এই নির্লজ্জতা ধরে ফেলেছেন।

[illegible] চোরের মতো সূক্ষ্ম হয়ে বীথি আলগোছে পাশ কেটে উঠে গেলো। কিন্তু সামনেই মামাবাবু, তার উপস্থিতিটা কালো, ভয়ঙ্কর একটা ছায়ার মতো দুলছে আজ আর তার নিস্তার নেই।

ক্ষেত্রবাবু চটি ফটফট করতে-করতে হঠাৎ থেমে পড়লেন, স্নিগ্ধ, মোলায়েম গলায় বললেন, 'এ কি, তোর একটা ছাতা নেই নাকি, বীথি? রোদে যে

একেবারে কালো হয়ে এসেছিস। দাঁড়া, কালই তোর জন্যে একটা বেঁটে-হাতের ছাতা কিনে আনবো।'

বীথি এমন ভাবে চেয়ে রইলো যেন সে তার মামাবাবুর মুখে স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছে। তার পায়ের নিচে এটা সিঁড়ি না স্বর্গ, তার কিছু আর ধারণা নেই।

'আর শোনো সমর,' মামাবাবু চটি ফটফট করতে-করতে নেমে গেলেন, 'তোমার গাড়িটা একদিনের জন্যে দিলে খুব ভালো হয়। বীথিকে একবার শহরটা বেড়িয়ে আনতুম। তিন বছর হয়ে গেলো ও এখানো ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়ালটা দেখেনি।'

সমরেশ বললে, 'তা দেবো, কিন্তু ড্রাইভার নেই, কদিন হলো বাড়ি গেছে।'

'তাতে কি!' মামাবাবুর গলা বীথি নির্ভুল শুনতে পেলো, 'তাতে কি! তুমিই তো ড্রাইভ করতে পারো।'

বীথি ঘরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। আশ্চর্য, ঘর-দোর, গাছ পালা, রাস্তা দোকান, আগেরই মতো সব ঠিকঠাক আছে।

মামাবাবু হঠাৎ আজকে তার উপর এতো উত্তাল কেন?

কারণ, কারণটা বীথি হাতের লেখার মতো স্পষ্ট পড়তে পারলো, কারণ কালকে টিউসানির মাইনেটা পেয়ে দশ টাকার একখানা নোট সে মামিমার হাতে গুঁজে দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, এবারও বীথি খুব ভালো ফল করতে পারলো না, পেলো মোটে একটা সেকেণ্ড ক্লাস।

যদি কারণটা সবাইকে সে আজ বলতে পারতো, তার নিজের বলে একখানা ঘর ছিলো না, ছিলো না নিজের বলে অনেক সময়, তারি জন্যে সে অমন নেমে গেছে, কেউই তা বিশ্বাস করতো না সজ্ঞানে। আর এ সব ব্যাখ্যা ধোপে কখনো টেঁকসই নয়। যাই কেননা কারণ হোক, চিরকাল সে সেই সেকেণ্ড-ক্লাসই থেকে যাবে।

মামিমা বললেন, 'তার জন্যে তুই দেখছি একেবারে বিছানা নিলি, বীথি। এমনিতে যারা পাশ করে, তাদের চেয়ে আরো কতোগুলি বই বেশি নিয়ে দিব্যি উৎরে গেলি শুনলুম, তবু কিনা তোর শোক। যাই বল্, তুই একটু বেশ বাড়াবাড়ি করিস, বীথি।'

টুরু তাতে আবার একটু দার্শনিক ফোড়ন দিলে, 'যেমন কতোগুলি ছেলে তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে, তেমনি কতোগুলি আছে আবার তলায় পড়ে। তাই চিরকাল হয়, বীথি। জীবনের কোনো পরীক্ষায়ই নিঃশেষে তুমি সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারো না। যেখানে তুমি এসে উঠেছ, সেই তোমার নিজের জায়গা। সবাই যদি এসে প্রথম হতো তা হলে জীবনে আর কোনো স্বাদ থাকতো না। কারু কারু চেয়ে কোনো কোনো বিষয়ে নিচু হলে আমাদের কিছুই এসে যায় না, বরং মাঝে থেকে পৃথিবীটাই বিচিত্র হয়ে ওঠে।'

বীথিকে তবুও শক্ত করা গেলো না।

'বেশ তো, একজামিনে প্রথম হওয়াই যদি তোমার জীবনের প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে, বেশ,' টুকু দরাজ গলায় বললে, 'সময় এখনো একেবারে ফুরিয়ে যায়নি, বীথি। এখনো একটা এম-এ বলে জিনিস আছে, তারি জন্যে না-হয় কোমর বাঁধো।'

তাই, এখনো আরো একটা তার সুযোগ আছে, বীথি আরো দুবছর চেষ্টা করে দেখবে।

সাংসারিক বৃত্তির কি ব্যবস্থা হবে তারি জন্যে প্রথমটা সে বিশেষ জোর করতে পারেনি, কিন্তু পরীক্ষা দেবার আগে ঠিক আকাশ থেকে বাবার একটা চিঠি এসে পড়েছিলো—নেত্রকোনায় হবেনের একটা চাকরি হয়েছে, পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে। অতএব, সংসারে মাস-মাস সে পনেরোটা করে টাকা দিতে না পারলেও কিছু বিশেষ অসুবিধে হবে না—বরং সেটা যেন ভাগ্যেরই একটা ইশারা, সে আরো একবার প্রাণপাত করে দেখবে, সত্যি সে তার মনের মতো অতিকায় কিছু-একটা করে ফেলতে পারে কিনা। আর একবার।

ঠাট্টায় ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে টুকু জিগগেস করলো, 'কিন্তু তারপর? এম এ পাশ করে?'

তারপর—বীথি যেন তারপর খানিকটা শাদা শূন্য দেখলো। তারপর—তারপরের কথা মানুষ কিছু ভাবতে পারে না।

কথাগুলোকে নিয়ে টুকু যেন মুখের মধ্যে চিবোতে লাগলো, 'আবার কতোগুলি শুকনো বই নিয়ে বসবে বীথি, মানুষের চিন্তার মরা কতোগুলি কঙ্কাল! কিন্তু কি তুমি আর শিখবে, মানুষে কতো বলো আর শিখতে পারে? ধরো, এবারও যদি তুমি ফার্স্ট হতে না পারো?'

বীথি ক্লান্ত গলায় বললে, 'কিন্তু না পড়েই বা বসে বসে কি করতে পারি? সুযোগ যখন পেলুম, মন্দ কি, এম-এটাই না-হয় পাশ করে ফেলি।'

'আশ্চর্য, তোমার জীবনে কিনা সামান্য একটা এম-এ পাশ করবারই সুযোগ এলো!'

'তা-ই বা ক'টা মেয়ে পায়?' বীথি করুণ করে বললে।

'কিন্তু কি তুমি পেলে? কনভোকেশানের গাউন পরে হাতে ডিপ্লোমা নিয়ে একটা ফোটো বাঁধিয়ে রাখা ছাড়া কি তুমি পাবে জীবনে?' তেতো, বিস্বাদ মুখে টুকু বলতে লাগলো, 'সমস্ত জীবন তুমি এমনি কেবল জানবে আর শিখবে, নির্বিচারে পরের মত কুড়িয়ে বেড়াবে—তোমার ঐ ফিলজফি তো শুধু কতোগুলি মতেরই মার-প্যাঁচ—নিজে তুমি কিছু জানাবে না, নিজে তুমি কিছু হয়ে উঠবে না? সংসারে এতো লোকের মত আছে, আর তোমারই একটা মত নেই? তুমি বারে-বারে কেবল পরের চিন্তার অধীনে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে আসবে, নিজের মতো করে তুমি নিজে হয়ে উঠবে না, বীথি?'

'তুমি আবোল-তাবোল কি বকছ, টুকু-দা?'

টুকু হেসে ফেললো, 'যদি আমার মতটাও তোমার কাজে লাগে, সেই আশায় একটা বক্তৃতা করছি।'

ভারি দুঃখিত,' বীথিও অল্প একটু হাসলো, 'হাততালি দিতে পারলুম না। মানুষে তবে কেন পড়ে, কেন জানে,' বীথি আবার গম্ভীর হয়ে গেলো, 'কেন তবে মানুষ উন্নতির, সভ্যতার এই বিরাট অভিযান চালিয়েছে?'

'যেখান থেকে তারা প্রথম রওনা হয়েছিলো সেইখানে ফের ফিরে আসবে বলে, সেই তাদের সুন্দর, সুস্থ অসভ্যতায়। জানো বীথি,' টুকু নির্লিপ্ততায় প্রায় অশরীরী হয়ে উঠলো, 'উন্নতিটা কখনো সরলরেখায় অগ্রসর হয় না, বৃত্তাকারে এগোতে থাকে—তা ফিরে আসে ফের ব্যর্থ একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করে—আর প্রত্যেক নতুনত্বকেই উন্নতি মনে কোরো না।' টুকু হাসলো। 'হাততালি যখন পাবো-ই না, তখন বক্তৃতাটা বন্ধ করি, কি বলো?'

গ্রীবায় একটি নরম ঢেউ তুলে বীথি বললে, 'হ্যাঁ।'
'কিন্তু, একটা কথা এতোক্ষণ তোমার ভুল হচ্ছিলো, বীথি,' টুকু দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, 'আমি মানুষের কথা বলছিলুম না, বলছিলুম মেয়েমানুষের কথা।'
এই করেই টুকু আরো তাকে খেপিয়ে দিয়ে গেলো। এম-এতে সে ফার্স্ট না হয় তো কি বলেছি।
কিন্তু নিজের বলে সে যদি আলাদা একখানা ঘর পেতো, পেতো যদি নিজের বলে কতোগুলি টাকা, উঃ, সুনাম বলে থাকতো না যদি তার কোনো কুসংস্কার।
তার সেই দীর্ঘনিশ্বাসটা বোধহয় ঈশ্বরের গায়ে লেগেছিলো—শেষ পর্যন্ত এম-এ পড়াটা তার হয়ে উঠলো না।
স্পেশ্যাল-পেপারে লজিক নেবে না এথিকস্ নেবে তাই নিয়ে বীথি তখন সিলেবাস ঘাঁটছে, এমন সময় বিনায়কবাবুর একটা চিঠি এলো। খামের উপর হাতের লেখাটা দেখেই বীথি ভাবলে, সর্বনাশ।
না, তার পড়া আর হতে পারে না, ওদিকে ঘটেছে দুর্ঘটনা। দাদা চাকরি পেয়ে বউকে সটান নেত্রকোনায় নিয়ে গিয়েছে, সেখানে পেতেছে নতুন সংসার। বাবাকে একটি পাই-পয়সা দেবারও তার নাম নেই।
তারপর দু'পৃষ্ঠা ধরে তার মুণ্ডপাত। পাজি, ইতর, ছোটলোক কোথাকার।
অতএব, এ-অবস্থায় সামান্য টিউসানি করে কোনোরকমে নিজের পড়াশুনো চালিয়ে বীথির কলকাতায় থাকা আর কি করে হতে পারে? বিনায়কবাবু কোনো দিকে কিছু পথ দেখতে পাচ্ছেন না, পাটের সঙ্গে স্বয়ং রাজ্যপাটের সম্বন্ধ, এখন মক্কেল যদি বা আছে, টাকা নেই—বীথির এখন কাজে না নেমে উপায় কি। সে এখন বড়ো হয়েছে, নিজেই সব

সে বুঝতে পারে আগাগোড়া। তার এখন কি কর্তব্য, বিনায়কবাবু কিছু বলছেন না, সে নিজেই ঠিক করুক।

বিনায়কবাবু যা বলেননি, বলা বাহুল্য, তা-ই বীথি ঠিক করলো।

তক্ষুনি সে চিঠি লিখে দিলো ফেরৎ-ডাকে

'দাদা অকৃতজ্ঞতা করে থাকে, তোমার কোনো ভয় নেই, বাবা, আমি আছি।'

আমি আছি—সেই স্বর, নির্ভীক উদাত্ত সেই স্বর, আকাশ থেকে আকাশে পড়লো ছড়িয়ে। বীথি তার নির্মোকনির্মুক্ত নতুন আমিত্বে উগ্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

ঘরের দেয়ালগুলো হেঁটে হেটে অনেক দূরে সরে দাঁড়ালো, এলো অনেক আলো, অনেক হাওয়া—আকাশে তার সমস্ত শূন্যতা উঠলো সঙ্কিত হয়ে। আমি আছি, আমি আছি—তার সমস্ত শরীর প্রস্ফুট হয়ে উঠলো শঙ্খের একটি নির্ঘোষের মতো।

কলকাতা তাকে ছাড়তে হলো না, এখানেই, সুমিত্রা পর্দা স্কুলে সে আশি টাকা মাইনেতে কাজ যোগাড় করলে। যে পঁয়তাল্লিশ টাকার থেকে একটা আধলাও দাদা দিতে পারেনি, পুরো সেই পঁয়তাল্লিশ টাকাই সে বাবাকে রেখে দিতে পারবে। তবে জনান্তিকে একটা মাত্র তার অনুরোধ আছে—সে মামার বাসায় আর থাকতে চায় না, সেটা সম্পূর্ণ মামার বাড়ি নয় বলে নয়, সুমিত্রা-পর্দা স্কুলের থেকে অনেক মাইল দূরে বলে। তাই সে স্কুলের কাছাকাছি ছোটখাটো দুটো ঘর নিয়ে আলাদা থাকতে চায়।

খবর পেয়ে বিনায়কবাবু সপরিবার আকাশে উড়লেন। টাকার সংখ্যাটায় যতো না তার তৃপ্তি হচ্ছিলো, তার চেয়ে বেশি হচ্ছিলো স্কুলের নামের পিছনে ঐ একটা পর্দার আবরণ আছে বলে। শুধু মেয়ে স্কুল বলে তিনি ততো আশ্বস্ত হতে পারেননি; পর্দা কথাটা তার মনে ভক্তির একটা

আবহাওয়া সৃষ্টি করলে, প্রায় একটা ডিসইনফেক্টেন্টের কাজ করলে বলা যায়। রাধা বলতেই যেমন কারু-কারু কাছে কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা উদ্ঘাটিত হয়, তেমনি পর্দা শুনতেই বিনায়কবাবু এক নিমেষে সেই স্কুলের উচ্চাদর্শটা আয়ত্ত করে নিলেন।

চাকরিটা যে ভালো সে তো সবাই জানে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলটাও যে ভালো, তা-ই বা কোথায় পাওয়া যায়?

'কিন্তু,' সর্বাণী বাসি পাউরুটির মতো শুকনো মুখে বললেন, 'কিন্তু খুকি ঐ একলা থাকতে চায়, না, কি লিখেছে বললে?'

বিনায়কবাবু উদারতায় একটু পেশল হবার চেষ্টা করলেন, 'ঠিকই তো, ক্ষেত্রবাবুর বাড়ির চেয়ে স্কুলটা অনেক দূরে—ওখান থেকে যাওয়া আসা করতে গেলে স্কুলই করা হবে না দেখছি। তা, আলাদা থাকতে চায়, কাছাকাছি কোনো একটা মেয়েদের বোর্ডিং বা ঐ জাতীয় কিছু একটা বেছে নিতে হবে। এতো বড়ো মেয়ে—আলাদা থাকবে কি!'

ছোট একটি নিশ্বাসে সর্বাণী বুকের থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর সরিয়ে দিলেন।

সেই কথাগুলিই বিস্তারিত করে বিনায়কবাবু বীথিকে চিঠি লিখলেন। আলাদা থাকতে চায়, তার স্বাস্থ্যের দিক থেকে, সে তো ভালো কথাই, কিন্তু—

কিন্তু, মানে, এই পর্যন্ত, তার বেশি আর নয়। ক্যানিউট যেমন ঢেউকে সম্বোধন করে বলেছিলো: দাস ফার এ্যাণ্ড নো ফারদার।

কিন্তু, কাছাকাছি, সুবিধেমতো একটা মেয়ে-বোর্ডিংই যেন সে পছন্দ করে নেয়। নিজের একটা ঘর হলেই তো মেয়েদের যথেষ্ট আলাদা থাকা হলো।

বাবার চিঠি পেয়ে বীথি মনে মনে হাসলো। আজ সে এতোটা প্রতিষ্ঠা

পেয়েছে, যাতে সে কম কবে একটা মেয়ে-বোর্ডিঙে এসে উঠতে পাবে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই হাসি সে পুষতে পাবলো না। বাইবে সে যেখানে খুশি গিয়ে মাস্টাবি কবে আসতে পাবে, যতো বিপদ তাব এই ঘবেব চাবপাশে। বাইবে খোলা আকাশ থাকলেও ঘবেব চাবপাশে আনতে হবে দেয়ালেব অভিভাবকত্ব।

বীথি বাবাব চিঠিব সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো—অক্ষবেব টানগুলিতে ফুটে উঠলো বা একটু রূঢ় অটলতা। লিখলে :

'আমাব জন্যে তোমাদেব কোনো চিন্তা'—'চিন্তা'-কথাটা কেটে বীথি অনেক ভেবে শেষে 'ভয়' লিখলো—'আমাব জন্যে তোমাদেব কোনো ভয় নেই, বাবা। বড়ো মেয়েবাই তো মাস্টাব হয়। একটা বয়েস পযন্তই মেয়েদেব নিয়ে যা ভাবনা, তাবপব আব তাদেব নিয়ে কোনো ভয় থাকে না। আশা কবি আমি এতোদিনে ততো বড়ো হয়ে উঠেছি।'

তাবপব—বীথি যা লিখলে সেটা সস্ত্রীক বিনায়কবাবুব ততো মনঃপূত না হলেও, কি কবা যাবে, মেয়ে যখন নিতান্ত চাকবিই কবছে, এবং তা সংসাব প্রতিপালন কবতে—সবজমিনে সমস্ত অবস্থাটা পযবেক্ষণ কববাব জন্যে বিনায়কবাবু কলকাতা চলে এলেন।

বালিগঞ্জেব দিকে মেয়েদেব কোনো বোর্ডিং নেই, শ্যামবাজাব থেকে স্কুল কবাব কথা ভাবাও যায় না, অতএব, বীথি লিখেছিলো : ভবানীপুব অঞ্চলে একটা প্রকাণ্ড ব্যাবেকে দুখানা ঘব নিয়ে ছোট একটা সে ফ্ল্যাট নিতে চায়। সেটা আগাগোড়া টুকবো-টুকবো বাঙালী পবিবাব দিয়ে ঠাসা—এমন কিছু সে একটা আফ্রিকায় গিয়ে পড়ছে না। হ্যা, বাড়ি ভাড়া দিতে কিছু টাকা তাব বেবিয়ে যাবে বৈকি, তাব জন্যে কোনো উদ্বেগেব কাবণ নেই, একটা টিউসানি বীথিব হাতে আছে, সংসাবেব ভাতায় সে টান দিতে যাবে না।

মাটিতে বসে পড়বার মতো কিছু খবর নয়, আশে-পাশে যখন অনেক বাঙালী পরিবার আছে ছিটিয়ে, আর যখন পঁয়তাল্লিশটা টাকা সুগোল পঁয়তাল্লিশটাই থেকে যাচ্ছে, তবু, কোথায় কতখানি জল, নিজের চোখে দেখবার জন্যে বিনায়কবাবু কলকাতা এলেন।

ক্ষেত্রবাবু, বলা বৃথা, প্রস্তাবটা বিশেষ সমর্থন করলেন না। কোন এক অপরিচিত, অনাত্মীয় লোক মাস-মাস কুড়ি টাকা করে বাড়ি-ভাড়া পাবে সেটা খুব একটা সুখবর নয়। যেন একমাত্র সেই তথ্যটাই বীথির সর্বব্যাপী কল্যাণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

বিনায়কবাবু মেয়ের দিকে ঘেঁষে দাঁড়ালেন, 'কিন্তু এখান থেকে বালিগঞ্জে গিয়ে স্কুল করবার কথা তুমি বলতে পারো না। এখন ওর নিজের বলে আলাদা একটা ঘর দরকার—তোমার বাড়িতে তো পিন ফোটাবারও জায়গা দেখছি না একটা।'

বাবার নতুন উদারতায় বীথি গদ্গদ হয়ে উঠলো।

ক্ষেত্রবাবু অনাবশ্যক রাগে ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'ঘর, শুধু একটা ঘর দিয়ে তোমার মেয়ে কি করবে? দিতে চাও তো তাকে একটা বাড়ি দাও যোগাড় করে,' মামাবাবুর কি সৌখিন শখ, 'মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও এবার। আগে তো শুনেছিলুম গ্রাজুয়েট না হবার আগে দন্তস্ফুট করবে না, এখন তো সে হাঙ্গামা চুকে গেছে, এবার পাত্রের সন্ধানে দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়ো।'

নাকের উপর থেকে বিনায়কবাবু একটু হাসলেন। ভাবখানা এই, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে এতো ভালো পাশ করে বীথিও কিনা সামান্য পাঁচি খেঁদির মতো বিয়ে করতে বসুক। তার সমস্ত অসাধারণত্বের জৌলুস কিনা শেষকালে বিয়ের জলেই ধুয়ে যাক।

'মেয়ে বিয়ে করতে না চাইলে আমি কি করবো?' বিনায়কবাবু কান

চুলকাতে-চুলকাতে বললেন, 'এখন সে রীতিমতো বড়ো হয়ে উঠেছে, তাকে তো আর জোর করে ছাদনাতলায় টেনে নিয়ে যেতে পারবি না।'

'মেয়ে বিয়ে করতে চায় না। মানে ?' ক্ষেত্রবাবু গর্জন করে উঠলেন।

'চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছ অহরহ।' বিনায়কবাবুর গলা যেন এবার সত্যের জোরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'এই তো পাশ করার সঙ্গে-সঙ্গেই কেমন লাফিয়ে একটা চাকরি নিয়ে বসলো। মেয়ের এখন একটা স্বাধীন মত হয়েছে—মত হচ্ছে জানো, বড়ো হওয়ারই একটা উপসর্গ—'

ক্ষেত্রবাবু মুখের থেকে কথাটা প্রায় কেড়ে নিলেন, 'সাধ করে বড়ো হতে তবে দিলে কেন মেয়েকে ?'

'বড়ো হতে দেবার আমরা মালিক নাকি ?' বিনায়কবাবু বিগলিত গলায় বললেন, 'বড়ো ও নিজেই হয়ে উঠলো। কোমল একতাল মেয়েলিত্বের মধ্যে থেকে খুঁজে পেলো ও ওর কঠিন মেরুদণ্ড।'

ক্ষেত্রবাবু মুখ কুঁচকে কথাটাকে প্রায় একটা ভেংচি কাটলেন। বললেন, 'দেখি কেমন ওর মেরুদণ্ডের জোর, ডাকি ওকে এখানে।' বলেই, বিনায়কবাবুর উচ্চ হাসির মাঝখানে, তিনি ডাক দিয়ে উঠলেন, 'বীথি। বীথি।'

তড়িৎ পায়ে বীথি এলো ছুটে। আজ্ঞাবহনের প্রস্তুতিতে সমস্ত ভঙ্গিটা তার রূপে ধরেছে।

মামাবাবুর [illegible] মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন, 'তুই নাকি বিয়ে করতে চাস না ? বিয়েতে নাকি তোর মত নেই ?'

বীথি থমকে গেলো।

'কি, জবাব দে, মত যখন তোর একটা হয়েইছে শুনছি, তবে সেটা স্পষ্ট করে জানাতে বাধা কি ?'

দ্যূত-সভায় দ্রৌপদীও হয়তো এতোটা বিড়ম্বিত হয়নি। পাষাণকায় স্তব্ধতার খোলের মধ্যে বীথি আপাদমস্তক আড়ষ্ট হয়ে রইলো।

'কি, বিয়ে করবি তো বল্, উঠে পড়ে লেগে যাই খুঁজতে।' মামাবাবু এবার বাবার দিকে তাকালেন, 'ধরা-ছোঁয়া যায় পাত্রই একটা আনতে পারলে না এখনো, ও মত দেবে কি? ও কাকে বিয়ে করবে?'

আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে বিনায়কবাবু স্মিতহাস্যে সায় দিলেন, 'সত্যি, কাকে বিয়ে করবে ও? ধারে-কাছে ওর যোগ্য পাত্র তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি নিয়ে আসবো যোগ্য পাত্র!' মামাবাবু লাফিয়ে উঠলেন, 'বলুক কি রকম বর ও চায়! একবার বলুক বিয়েতে ওর মত আছে। কি, তুই যে একেবারে লজ্জায় কুঁকড়ে আছিস, বীথি? এই বুঝি তোর বড়ো হবার নমুনা? সামান্য একটা হ্যাঁ বলতে তুই এতো ভাবছিস?'

বীথি তার বাবার দিকে একবার হয়তো তাকিয়েছিলো, কিন্তু তাকাবারও হয়তো কোনো দরকার ছিলো না। সেই দোদুল্যমান স্তব্ধতায় বাবার সকাতর দুই চক্ষুর মিনতি বীথি তার চামড়ার উপর যেন স্পষ্ট স্পর্শ করতে পারছে।

কিন্তু তাই বলে সামান্য একটা না-ও বলতে পারলো না।

বীথি অপমানে জ্বলে উঠলো, কেননা এখন অপমানে জ্বলে উঠলেই তাকে সুন্দর দেখাবে। বললে, 'তুমি এখানে হাত-পা ছেড়ে বসে আছো কি, বাবা? তোমার না আজ ওখানে গিয়ে সেই বাড়িটা দেখে আসবার কথা ছিলো? ওঠো।'

'মাস্টার, খুব মাস্টার হয়েছিস, বীথি,' মামাবাবু বিরক্তিতে রুখে উঠলেন, 'কিন্তু তোদের আবার মাস্টারি কি? তোরা চাকরানি হবি, দাসী হবি, মীরার মতো সমস্ত জীবন দিয়ে বলবি: মইনে চাকর রাখো জী। দাস্যের চেয়ে কি আর মেয়েদের সম্পদ আছে?'

বিনায়কবাবু চেয়ার ছেড়ে জয়ীর মতো উঠে দাঁড়ালেন, 'সে-সব দিন আর নেই, ক্ষেত্তর। মেয়েরা আজকাল অনেক এগিয়ে গেছে।'

বাড়ি দেখতে বেরুবার আগে মেয়েকে একটু ফাঁকায় পেয়ে বিনায়কবাবু বললেন, 'ক্ষেত্তরটা একেবারে সেকেলে। কুসংস্কারে হলদে হয়ে গেছে। বিয়ে ছাড়া আর কোনো বড়ো কাজ ও দেখতে শিখলো না। বিয়ে ছাড়া আর যেন সংসারে কিছু করবার নেই। হবেই তো, ন্যাবায় যে ভুগছে, সে চারপাশে দেখবেই তো কেবল সর্ষে-ক্ষেত। ছি, রাজধানীতে থেকেও কিনা ওর এই হাল! না, ব্যাবাকটা যদি ভালো হয়, এ বাড়ি তোকে ছাড়তেই হবে, বীথি।'

বীথি নীরবে একটু হাসলো। এই নিয়ে আবার কিনা এতো আলোচনা! সংসারে যে মেয়ে টাকাই রোজগার করতে পারলো, তার আবার ভাবনা কি! ইচ্ছে করলে সামান্য সে একটা আর বিয়ে করতে পারবে না?

বাড়িটা শেষ পর্যন্ত বাবা অনুমোদনই করে এলেন। সবগুলিই প্রায় সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবার, একজনকে তো তাঁর গ্রাম-সম্পর্কে জ্ঞাতিই বলা চলে। সময়ে অসময়ে, তার মানে সব সময়ে, বীথির উপর তাঁরা যেন সস্নেহ, তার মানে সন্ধিৎসু দৃষ্টি রাখেন, সেই কথা তাঁদের তিনি বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন।

যাবার আগে বীথিকে তিনি কতোগুলি মহামূল্য উপদেশ দিলেন, সেগুলির মধ্যে একটা ছিলো গুপ্তধনের মতোই সযত্নরক্ষণীয়

'বিয়ে করতে যখন রাজি হলি না, তখন; এবার থেকে ক্ষেত্তর কেবল তোর খুঁৎ ধরতে চেষ্টা করবে। খুব হুসিয়ার, মা, কেউ যেন মুখব্যাদান করতে না পারে। ইস্কুল—ইস্কুলের কাজ ফুরিয়ে গেলে বাসা, দিব্যি ছাদ আছে, সেখানেই বেড়াতে পারবি ইচ্ছে করলে। বেশ খাবি দাবি, পড়া করবি—প্রাইভেটে এম এটাও তো দিয়ে ফেলতে হবে—কারু

কোনো ধার ধারবিনে, থাকবি মনের স্ফূর্তিতে। আর টিউসানি যদি দুটো-একটা বেশি পাস, কিছু-কিছু জমাবার অভ্যেস করবি—বিপদ-আপদে কখন কি দরকার হয় কে বলতে পারে? আর করছর অন্তর ইস্কুলে মাইনে বাড়বারও তো কথা আছে, চারদিক বেশ একটু গুছিয়ে নিতে পারলে তোর মাকেই একদিন পাঠিয়ে দেবো'খন। মন্দ কি, সবাই মিলে কলকাতাতেই না-হয় তখন থাকা যাবে।'

তারপর সত্যি-সত্যিই একদিন ঘোড়ার গাড়ির মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে বীথি তার নতুন বাড়ির দিকে রওনা হলো। গাড়ির চাকায় মুখর হয়ে উঠেছে তার সমস্ত রক্ত।

মুখোমুখি সিটে টুকু ছিলো বসে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, জানলার বাইরে বীথি বিস্মিত চোখে বারে-বারে তাকাতে লাগলো, টুকু-দার সঙ্গে একা এক গাড়িতে বসে সে ভবানীপুর যেতে পারছে, অথচ রাস্তাটা কিনা আজ চাকার নিচে বসে যাচ্ছে না।

কতোদূর এগিয়ে গেলে, যেন কি গভীর সান্ত্বনা দিচ্ছে, তেমনি স্বরে টুকু বললে, 'শেষ পর্যন্ত একটা মাস্টারই হলে, বীথি। আর কিছু নয়?'

বীথি মুচকে হেসে বললে, 'তুমি তো তাও হতে পারলে না। তুমি কিনা এখনো একটা ছাত্র।'

'আমার কথা কিছু বোলো না।' টুকু দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ভান করলো, 'আমি তোমার কথা, তোমার মাঝে চিরন্তন একটি মেয়ের কথা ভাবছিলুম।'

'থাক,' বীথি খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'আমার কথা ভেবে মুখখানা অমন তোমার বুদ্ধের মতো প্রশান্ত করতে হবে না। তব আমি, তোমার সেই ঘৃণিত মেয়েদের মধ্যে থেকে একজন, এই আমি—তবু তো একটা কিছু হলুম। তাই বা কম কি।'

'জীবিকা-নামক যন্ত্রের ক্ষুধার্ত একটা উদ্ভাবনই মাত্র হলে—হলে শুধু একটা মাস্টার,' টুকু উদাসীনের মতো বললে, 'কিন্তু তুমি সত্যিকারের তুমি হয়ে উঠবে কবে?'

বীথি দৃঢ় গলায় বললে, 'এর চেয়ে বৃহত্তরো কোনো আমিত্বে আমি বিশ্বাস করি না। আমি আমার বিপন্ন পরিবারের কাজে লাগছি, আবিষ্কার করছি আমার স্বাধীন কর্মক্ষেত্র, এই আমার যথেষ্ট আমি, এই আমার যথেষ্ট মুল্যবান হয়ে ওঠা!'

'তোমার জন্যে যদি আমার কষ্ট হয়, বীথি, আমাকে তা হলে মার্জনা কোরো।' টুকু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে গাইড করতে লাগলো।

আর কি চাই—বীথি পেয়ে গেছে তার নিজের বলে আলাদা একখানা ঘর, নিজেকে ঘিরে নিবিড় একটি নিভৃতি। তার অব্যাহত একাকীত্ব।

আর কি তার চাইবার আছে! এই ঘরে বসে সে ইচ্ছেমতো ভাবতে পারে, ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখতে পারে। ইচ্ছে করলে বন্ধ করে দিতে পারে দরজা। দরজা বন্ধ করে হাত-পা ছুঁড়ে নাচলেও কেউ আর তাকে কিছু বলতে আসছে না।

সে পেয়ে গেছে তার ঘর। তার বুকের মতো উত্তপ্ত, তার মৃত্যুর মতো উলঙ্গ এই একটি ঘর।

সে দাঁড়িয়েছ এখন তার নিজের মুখোমুখি।

কি চমৎকার—পুবের জানলা দিয়ে ঘরে যখন রোদ এসে পড়ে, মনে হয় ঐ রোদ একান্ত করে তারি জন্যেই আকাশ আজ পাঠিয়ে দিয়েছে তার সানন্দ অভিবাদন। যখন বিছানার এক পাশে চাঁদের রূপালি একটি রেখা চুপি-চুপি এসে শুয়ে থাকে, মনে হয় ঐ চাঁদ একান্ত করে তাকে দিয়েই তৈরি, তার শীতল নিঃসঙ্গতা দিয়ে!

আর সে কি চায়! ঘর ভরে তুলেছে সে ছোট-খাটো অস্তিত্বের আসবাবে—ছোট্ট সোফার মতো নরম, নির্মল একটি বিছানা—যতোক্ষণ খুশি না-ঘুমিয়েও সে শুয়ে থাকতে পারে। পিঠ-তোলা সে একটা চেয়ার পেয়েছে এতোদিনে, তার টেবিলে আজকাল আর খুঁজে-পেতে এনে খবরের কাগজ পাততে হয় না। শাড়িগুলি আজকাল সে একাই পরতে পারে, এ-ছুটে ধোবাবাড়িতে তার কখানা কাপড় যাবে সেই বিষয়ে সে এখন একেবারে

অরাজক। বইগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবাস করতে পারে, চুলের কাঁটাগুলি এখন একেবারে তার ঘড়ির কাঁটায়। সব চেয়ে বড়ো কথা, তার বাথরুমের দরজার সামনে আর কেউ এখন প্রতীক্ষা করে নেই, ইচ্ছেমতো স্নান করতে পারে সে জল ঢেলে। জুজুবুড়ির মতো গ্রীষ্মকালকে সে আর ভয় করে না, তার শোয়াটা বিচ্ছিরি কি সুশ্রী, সেই বিষয়ে দেয়ালগুলি নির্বিকার। আকাশে খুব মেঘ করে বৃষ্টিই যদি নামলো ধরো, তবে না হয় সে আজ ভুলেই গেলো চুল বাঁধতে। এর বেশি আর সে কি চায়—এই মুক্তি, এই নির্জনতা। খিদে পেলে যখনি-তখন সে খেতে পারে, ভাবতে পারো, মেয়ে হয়ে তাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয় না। কোন বেলা কি খাদ্যের জন্যে জিভটা তার সুড়সুড় করছে, ভয় কি, একটা ঝি রয়েছে তার হাতের কাছে। তারই কিনা আবার একটা দাসী। ফরমাশ করলেই হলো—এমন কি, ইস্কুল থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসে তাকে দিয়ে পা দুটো সে টিপিয়েও নিতে পারে ইচ্ছে করলে। ইচ্ছেমতো সমস্ত টাকাই সে খরচ করতে পারে না এই কথা যদি বলতে চাও তো বলো, তবু, তারই তো টাকা, অবিমিশ্র তারই তো টাকা সে খরচ করছে। এর চেয়ে কি এমন সুখ সে স্বর্গে গিয়ে কল্পনা করতে পারতো?

বলো, আর সে কি চায়। দুই শক্ত মুঠিতে তুলে নিয়েছে সে তার আপন জীবন, দুই পায়ে দাঁড়িয়েছে সে এসে কঠিন মাটির উপর। দুই মাসে সংসারের শ্রী দিয়েছে সে ফিরিয়ে। উঠোনে আর সেই আগাছা নেই, সিঁদুর পড়লে হাত দিয়ে চেঁছে এখন তুলে নেয়া যায়। রান্নাঘরের চাল ফুঁড়ে আগে জল পড়তো, এখন নতুন করে সেটা ছাওয়া হয়েছে, নতুন করে উঠেছে ফের গোয়াল-ঘর। হাটে গিয়ে বাবা দুবেলা একটা গাই কিনে এনেছেন—সেটার কি নাম রাখা হবে তা পর্যন্ত বীথির উপর ভার। সবাইর আগে মা'র চুড়ি ক'গাছ সে ছাড়িয়ে এনেছে—সেই দুটি হাত আবার

কেমন চোখে এখন স্নিগ্ধ লাগছে। চোয়ালের হাড় দুটো আবার কেমন মাংসে গিয়েছে ডুবে, আবার তাঁর কোল ঘেঁষে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে। একে-অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি, কামড়া-কামড়ি করে ভাইবোনগুলিকে আর টুকরো-টুকরো জামা-কাপড় যোগাড় করতে হয় না, বাবার শার্টগুলির ক্রমে-ক্রমে ফতুয়া হওয়াটা বন্ধ হয়েছে। বাবা আজকাল এতো নিশ্চিন্ত যে নিয়মিত গোঁফটা পর্যন্ত কামাতে পারছেন, উদ্বেগে ঘন, বিরক্তিতে ধারালো তাঁর সেই গোঁফ। বৃত্তি না পেলেও তারই দৌলতে ছোট বোনটা ইস্কুলে পড়তে পারছে, তাঁর বিয়ের বেলায় পণের যদি নেহাত দরকারও হয় ধরো, কিছু আর বিশেষ ভাবতে হবে না। সমস্ত সংসারে এসেছে এমনি একটি অবকাশের সুর। ঘোলাটে মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে এখন নীল নির্মুক্তি।

বীথিই তো আছে, আর তাঁদের কিসের কি ভাবনা!

হ্যাঁ, সে আছে, সত্যিই সে আছে, এই চেতনার দীপ্তিতে বীথি তলোয়ারের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে পেয়েছে তার জীবনের স্বাদ, বাঘ যেমন পায় রক্তের গন্ধ। তার মাঝে যে এই সম্ভাবনীয়তা ছিলো, এতো বিপুল বৈচিত্র্য, তার আবিষ্কার তাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। মেয়ে হয়ে এতো মহিমার সে কোনোদিন স্বপ্ন দেখেনি। সমাজে সংসারে তার যে কোনোকালে এতো দাম হতে পারে—রীতিমতো টাকার অর্থে—এ-কথা ভাবলেও সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাবার কাছে তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই—ভাগ্যিস তিনি দিয়েছিলেন তাকে এই বিস্তীর্ণ সুযোগ, বড়ো হবার, সক্ষম হবার, চিরজীবী হবার। নইলে সে অগণ্যের মাঝে কোথায় থাকতো নগণ্য হয়ে! দাদা যা পারলো না, স্বয়ং বাবা যা পারলেন না, সামান্য মেয়ে হয়ে তাই সে অনায়াসে সম্পন্ন করলো—সামান্য আর তাকে বলে কে—সে এক, সে একাকী, সে নিজেকে নিয়ে নিজে। এতো ঐশ্বর্য

সে রাখবে কোথায় ? বাবা আজকাল শব্দ করে হাসছেন, মা দস্তুরমতো সেমিজ গায়ে দিচ্ছেন, ছোট ভাইবোনগুলিকে আদর করে ছোঁয়া যাচ্ছে। সে না থাকলে কি উপায় হতো সংসারের—বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিই যে কানা হয়ে থাকতো।

তাই বলে তার মাঝে সূক্ষ্ম চোখে এতোটুকু একটা খুঁত খুঁজে পাও তোমার সাধ্য কি ! তার দৃঢ়তার দুর্গে কোথাও একটা দুর্বল ফাটল নেই। তার দিকে তাকাও, সেফটিপিনের খোঁচা লেগে চোখ তোমার অন্ধ হয়ে যাবে। সে সমস্ত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে তার খুব-তোলা উঁচু জুতোয়, তার দৃঢ়ীভূত খোঁপার ঔদ্ধত্যে। শত হাওয়া দিক, গাছ ভেঙে পড়লেও তার আঁচলটা কখনো এক ইঞ্চি এলোমেলো হবে না, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক, ইস্কুলটা তার টিঁকে থাকলেই হলো। তার দিকে তাকাও, কিন্তু সে কোথায়, বড়ো-বড়ো অক্ষরে দেখবে শুধু একটা সুনামের বিজ্ঞাপন ! অভ্রভেদী একটা আত্মরক্ষার অহঙ্কার ! তার সঙ্গে কথা বলতে যাও, আর তুমি তাকে নেহাত, আইনের ভাষায় বলতে গেলে, লিডিং কোশ্চেনই জিগগেস করতে পারো, দেখবে, তার ডান-দিকে 'হা,' বাঁ-দিকে 'না'—সরাসরি, সুসমাপ্ত, তার মাঝে মাঝামাঝি কোনো মীমাংসা থাকতে পারে না। তার শুধু মতই পেতে পারো, যদি চাও, এবং সংসারে যারা মতেরই সাধনা করে, তাদের মন বলে কোনো উপদ্রব নেই। সে বাস করছে তার এই অমলিন মনোহীনতায়।

মামাবাবু কিছু বলতে আসুন না দেখি। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে মামিমাকে সে একজোড়া শাড়ি কিনে দিয়েছে, ছেলেপিলেদের কতোরকম খেলনা আর খাবার—তাই যথেষ্ট, মামাবাবুকে কিছু আর দিতে হবে না গায়ে পড়ে। মামাতো বোনটা গান শিখতে চায়, সে রাজি হয়েছে একটা হার্মোনিয়াম কিনে দিতে। যার কিনা এতো স্নেহ, এতো শ্রদ্ধা, সে কখনো

খাবাপ হতে পাবে নাকি ? টাকা না থাকলে তাব কিন্তু, হায়, স্নেহও থাকতো না, কেননা, সে তখন তা দেখাতো কি করে ? আব টাকা যখন তাকে নেহাত বোজগাবই কবতে হচ্ছে, তখন সে ইচ্ছে কবলে, মানে টাকাব খাতিবে, আলাদা ঘবে থাকতে পাবে বৈকি। মামাবাবু সে বিষয়ে উদাব হচ্ছেন ক্রমে-ক্রমে। কেননা তিনিও বুঝতে পেবেছেন, গবিব আব বড়োলোকেব সম্বন্ধে সুনীতিব একই নিয়মকানুন খাটতে চায় না।

তাব এই আলাদা ঘব—এই ঘবকে সে নিয়ে এসেছে, মেলে দিয়েছে, নিবন্তবাল আকাশেব নিচে। ঘবেও সে, বাইবেও সে—পৃথিবীতেও সে ছাড়া কোনো লোক নেই, থাকবাবও কোনো কথা নয়। সূর্যেব মতো সে একা। মববাব আগেকাব বিন্দুতম মুহূর্তে হয়তো বা সেই মৃত্যুপথযাত্রীব মতো।

মাঝে-মাঝে টুকু দা শুধু আসে, আব কোনো বিবলতম দিনে বা সমবেশ। টুকু-দা এলে সে খুশিই হয়, কেননা টুকু-দা তাব আত্মীয়, দবজাটা তখন ভেজানো থাকলেও কিছু আসে-যায় না। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, সমবেশকে সে পছন্দ কবে না মোটেই, মোটেই পছন্দ কবে না মানে ভয় কবে, কেননা তাব সঙ্গে তাব কোনো আত্মীয়তা নেই, কেননা সে সমাজেব অনুমোদন নিয়ে আসেনি। তাই দবজাটা সে অবাবিত খুলে বাখে, সমবেশেব চলে যাবাব জন্যে প্রশস্ত একটি ইঙ্গিত।

কিন্তু লোকটা তক্ষুনি তক্ষুনি না উঠলে কি কবা যায় ? তাকে তো আব ধাক্কা মেবে তুলে দেয়া যায় না!

চলে যেতে বললেই হয়! কিন্তু কি এমন অন্যায় বা অসুবিধে তোমাব কবছে যে তাকে তুমি মুখেব উপব ‘চলে যান’ বলতে পাবো ?

না-খুললেই হয় দবজাটা! কি কবে তুমি বুঝবে যে সে এসেছে! আব যদি বোঝোও, অনববত দবজায় ঘা দিলে চুপ কবে দাঁড়িয়ে কতোক্ষণ তুমি

তোমার বুকের শব্দ শুনতে পাবো! তার চেয়ে সোজাসুজি দরজাটা খুলে দিলেই ফুরিয়ে যায়! তুমি তখন দুর্ভেদ্য হয়ে বসে থাকতে পারো তোমার অটল গাম্ভীর্যে। নিজের কাছে সে-ই তো কতো হালকা হয়ে যাওয়া। তোমার ভয় কি! সামান্য একটা পুরুষের কাছে তোমার ভয়? ছি!

কিন্তু তোমার সাধ্য কি তুমি সমরেশের সঙ্গে কথা বলবে, অথচ একটুও হাসবে না। সত্যি করে বলতে গেলে, সেইখানেই তো তার বেশি ভয়, তার হেসে উঠতে হয় মাঝে-মাঝে। তার মুখের হাসি শুনলে তার নিজেরই কেমন বুকের মধ্যে থেকে ঠাণ্ডা একটা ভয় করে ওঠে। সমরেশের সামনে সে যেন আশানুরূপ 'ভালো' থাকতে পারে না।

এর পর ক'টা মাস আমরা স্বচ্ছন্দে কেটে বাদ দিতে পারি। একটা মেয়ের মাস্টার-জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমির ইতিহাস নিয়ে আমরা কি করবো ?

বীথি ইস্কুল যাচ্ছে, ধরো এক শুক্রবার, বাবার হাতের লেখার ভারি একটা লেফাফা এসে হাজির।

স্ফীতকায় একটা সুখবরই বলতে হবে। বাবা লিখেছেন পরোক্ষ-বিবৃতিতে :

গতকল্য বীথির একটি ভাই হয়েছে। তার মাতার প্রায় জীবনসংশয় হয়েছিলো, সিভিল সার্জনকে না-ডাকিয়ে আর উপায় ছিলো না। বিনায়কবাবুর হাত একেবারে নিঃস্ব, টাকার এতো দরকার, চিঠিটা আঠা দিয়ে মোড়বার পর্যন্ত তর সইছে না। চিঠি পাওয়ামাত্রই হাতে না থাকে, যেন সে তার সেভিংস-ব্যাঙ্কের বই থেকে (নিশ্চয়ই কিছু জমেছে) টাকা তুলে টি এম-ও করে পাঠিয়ে দেয়। হরেনকেও লেখা হয়েছে, কিন্তু সে-কুলাঙ্গার কোনো কিছুতেই গ্রাহ্য করবে বলে মনে হয় না।

এ তো গেলো সমূহ বিপদের কথা। তারপর

'দিন-দিন খরচ কেবল বেড়েই চলেছে আগুনের মতো। হয় তো মাকে আরো একটা টিউসানি নিতে হয়, নয় তো এতো ভাড়া দিয়ে আলাদা বাসায় তোমার থাকা চলে না। একটা মেস-টেসই দেখে নাও মেয়েদের, কি করবে, সংসারটা তো সামলাতে হবে আগে। আগে বাঁচলে তো পরে বিলাসিতা।'

তারপর আরো আছে :

'তুমি যে এই অযোগ্যের ঘরে কতো বড়ো রত্ন, তুমি যে কি কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমনিষ্ঠ, অধ্যবসায়ী মেয়ে, তুমি যে পৃথিবীতে অসাধারণত্বের আদর্শ নিয়ে এসেছ—'

শেষের প্যারাগ্রাফটা বীথি আর পড়তে পারলো না। স্খলিত একটা ভারের মতো চেয়ারে বসে পড়লো।

টাকা—টাকা—আরো টাকা চাই। আরো একটি গ্রাস এসে আস্তে-আস্তে হাঁ করেছে।

কিন্তু, শ্রমনিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু মেয়ে, কতোক্ষণ তুমি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারো?

না, গোটা চল্লিশ টাকা এখনো তার হাতে আছে। তার থেকে কুড়িটে টাকা সে বাবার নামে টি-এম ও করলে। আর বাকি কুড়িটা নিয়ে—আশ্চয, কাউকে সে জিগগেস করলে না, কারুর সে একটা মৌখিক মত নিলে না, রাস্তা দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলো।

ভয় নেই, দাদার কাছে সে নেত্রকোনা যাচ্ছে।

বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। ফলন্ত বাগানে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর।

'কে, বীথি, না?' হরেন যেন আর মাটির উপর দাঁড়িয়ে নেই, 'এ তোর কি চেহারা হয়েছে? আমি যে গোড়ায় তোকে চিনতেই পারিনি।'

'আমার চেহারার দিকে তোমার চাইতে হবে না।' সারা রাস্তার রোদের চেয়েও বীথি ঝাজালো গলায় বললে, 'কিন্তু তোমার এ কি চরিত্র!'

'কেন, আমি কি করলুম?'

'তুমি কি করলে মানে?' রাগে বীথি অনাবৃত, স্পষ্ট হয়ে উঠলো, 'তুমি চাকরি করছ, বাবাকে তবু এক পয়সাও পাঠাও না কেন?'

হবেন হো-হো করে হেসে উঠলো, 'বা রে, আমি পাঠাবো কেন, আমি কোত্থেকে পাঠাবো ?'

'তুমি আয়েস করে বসে-বসে দিব্যি মোটা হবে,' বীথি রাগে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো, 'আর একা খেটে মরবো কেবল আমি ?'

'খাটবিনে ? তুই যে বোকা, তুই যে মেয়ে। তুই যে উড়াল দিয়ে পাশ করতে গিয়েছিলি,' হবেনের গলা মমতায় জুড়িয়ে এলো, 'খেটে-খেটে হাড়িডসার হয়ে ভালো করে পাশ করতে গিয়েছিলি যে। ভালো পাশ করে ভালো চাকরি না করলে তোকে মানাবে কেন ? কিন্তু আমার কি ? ছোট আশা, ছোট আয়, ছোট মন। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনেতে আমি কি করবো ?'

পঁয়তাল্লিশ টাকাই যখন মাইনে,' বাঁকা-বাঁকা করে কথাগুলিকে বীথি উচ্চারণ করলে, 'তখন সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেলে কেন ? বাবা-মা'র দুঃখটাও তো একবার বুঝতে পারতে ?'

'আমার দুঃখটাই বা কে বোঝে, বীথি ?' হবেন কাতর গলায় বললে, 'আলাদা না হলে বাঁচতুম কি করে ?'

'এ তোমার কি স্বার্থপরের মতো কথা, দাদা।'

'স্বার্থপর।' হবেন মুখের উপর উদাসীন একটি হাসি প্রসারিত করে বললো, 'স্বার্থপরতাটা জীবনের একটা চমৎকার গুণ, যদি তুই বাঁচতে চাস সত্যি-সত্যি। পরের কারণে স্বার্থ দিয়ে বলি, এ জীবন মন সকলি দাও—এ হচ্ছে তোদের মেয়েলি কবিয়ানা।'

'তা তো তুমি বলবেই। তোমার গুণপনা যে শশিকলার মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে।' বীথি ঠাট্টায় ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'তুমি যে বিয়ে করেছ।'

'তা তো করেইছি—এতে কিছু সত্যি লজ্জিত হবার ভাব করতে পারছি

না। আর বিয়েই যখন করেছি,’ হরেন তেমনি লাজুক গলায় বললে, ‘তখন সঙ্গে-সঙ্গে একটু কাপুরুষও হতে হয়েছে বৈকি।’

‘চমৎকার তোমার পুরুষত্ব!’ বীথি চেয়ারের মধ্যে ছোট হয়ে গেলো, ‘এ-কথা বলতে জিভটা তোমার খসে পড়লো না, দাদা? কই তুমি বাবার এই সংসারযুদ্ধে তাঁকে সশস্ত্র সাহায্য করবে, না, নিজের পুঁটলিটি নিয়ে আলগোছে পালিয়ে এসেছ?’

কোমল করে হরেন বীথির রৌদ্ররুক্ষ মুখের দিকে চেয়ে রইলো। হাসিমুখে বললে, ‘শাস্ত্রেই তো আছে জানিস, যঃ পলায়তি, সজীবতি। পালাতে যদি পারতিস, বীথি, দেখতিস তুইও কখন বেঁচে গেছিস। যুদ্ধে প্রাণ দেয়ার মধ্যে ততো মহত্ত্ব নেই, যতো যুদ্ধ জেতার মধ্যে আছে।’

‘যুদ্ধ থেকে পালিয়ে তোমার যুদ্ধজয়ের গৌরব করতে বোসো না, দাদা।’ বীথি রাগে ও গরমে ছটফট করে উঠলো, ‘কিন্তু বউকে মা-বাবার কাছে রেখে মাস-মাস তাঁদের কিছু টাকা তুলে দিতে তোমার বাধছিলো কোথায়? বউকে তো সংসারের জন্যেই বিয়ে করেছিলে শুনেছিলুম।’

‘ও তুই ঠিক বুঝবি না, বীথি, বিবাহিত পুরুষের স্ট্যাণ্ডপয়েণ্ট।’ হরেন উঠে পড়লো, ‘তার চেয়ে আগে চান-টান করে খেয়ে-দেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নে।’

বীথি ম্লান হয়ে বললে, ‘এর চেয়ে ঠাণ্ডা আর মানুষে কি করে হতে পারে?’

‘তা হলে শোন।’ হরেন বীথির চেয়ারের কাছে ঘেঁষে এলো, যেন কি গভীর গোপন কথা বলছে তেমনি স্বরে বললে, ‘আগে ভেবেছিলুম ও সমস্ত পরিবারের, কিন্তু অনুভব করে দেখলুম ও একান্ত করে কেবল আমার। পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের পুঁটলিটি তাই খুইয়ে আসতে পারলুম না। বলেছিই তো, বিবাহিত পুরুষের স্ট্যাণ্ডপয়েণ্টটা তুই বুঝবি না, বীথি।’

'তোমার শুধু বিবাহিতত্বটাই দেখছি দাদা, পুরুষত্বের এতোটুকু পরিচয় পাচ্ছি না।'

'তা হলে আরো শোন।' হরেন এবার বীথির শ্রমনিষ্ঠ, কঠিন একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো, 'ছেলে যখন বিয়ে করলো, তখন জানবি সে বাপ-মায়ের কাছে ভীষণ অপরাধ করলো, আর ছেলে যদি বউকে ভালোবাসলো, তা হলে সে-অপরাধের তুই পার খুঁজে পাবি না। কিন্তু তুইই বল, শত বউ হলেও তাকে এক-আধটু না-ভালোবেসে মানুষে কি করে থাকতে পারে? বেলা তিনটে পর্যন্ত মুখে এক ফোঁটা তার জল যেতে না দেখলে কার না ছুটো লুকিয়ে খাবার কিনে দিতে সাধ হয়? চোখের সামনে অনবরত ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় পরতে দেখলে কার না ইচ্ছে করে ভালো দেখে একটা শাড়ি এনে দি? তোরই বিছানায় শুয়ে একটা লোক যদি সারা রাত জ্বরে গোঙায়, তোর সাধ্য কি তুই পর দিন একটা ডাক্তার নিয়ে না আসিস?'

'কে তোমাকে বারণ করছিলো?'

'সমস্ত সংসার। একান্নবর্তী পরিবারে স্ত্রীকে ভালোবাসা একটা মহাপাপ। ডাক্তারের ভিজিট না দিয়ে সেই টাকায় সংসারের কয়লা হতো—বউর একখানা শাড়িতে শতশ্ছিদ্র হয়ে বেরিয়ে পড়তো সমস্ত সংসারের নির্লজ্জ উলঙ্গতা। তাই,' হরেন নিষ্ঠুরের মতো বললে, 'যখন দেখলুম, তাকে আমার ভালোবাসার পাত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা করা হচ্ছে না, সংসারের একটা কর্মক্ষম যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন আমি তার ব্যর্থতা আর কিছুতেই বইতে পারলুম না, তার জন্যে আমার আরো বেশি মায়া করতে লাগলো। তোর কেউই নেই বীথি,' হরেন তার হাতে সস্নেহ একটু চাপ দিলে, 'তোর এই অমানুষিক ব্যর্থতা যে বুঝতে পারে।'

'থাক, এব পব আমার জন্যে আর তোমাব মায়া করতে হবে না,' বীথি জোব কবে হাত ছাড়িয়ে নিলে।
'তখনই আমাব বেড়ে গেলো দায়িত্ব, আমাব ভালোবাসাব দায়িত্ব, আমি বিয়ে কবেছি। টিউসানিটা ছেড়ে দিয়ে যে কবে হোক সত্যি-সত্যি একটা চাকবি যোগাড় কবে নিলুম—ভাগ্যিস বিয়ে কবেছিলুম, বীথি, তাই না আমাব দায়িত্ব এতো বেড়ে গিয়েছে, তাই না আমি আমাব পুরুষত্ব নিয়ে অহঙ্কার কবতে পাবছি।'
'থাক, যথেষ্ট হয়েছে।' বীথি স্থিব চোখে হবেনেব দিকে তাকালো, 'কিন্তু, তুমি কেবল তোমাব বউব কথাই ভাবলে, বাবা-মা'ব কথা ভাবলে না, ভাবলে না একবাব তোমাব ছোট-ছোট ভাইবোনগুলিব কথা।'
'নিজে বাঁচলে বাপেব নাম!' হবেন অদ্ভুত কবে হেসে উঠলো, 'নিজেকে বাঁচাবাব মতো মহৎ কীর্তি মানুষেব আব কিছু থাকতে পাবে না, বীথি। সমস্ত সংসাবে অসংখ্যেয় কতোগুলি শূন্যেব মাঝে আরেকটা শূন্য যোগ দিয়ে যোগফল আমি বাড়াতে পাবতুম না, তাই পালিয়ে এলুম, আলাদা হয়ে গেলুম, হয়ে উঠলুম এক, আব শূন্য নয়। হোক আমাব মোটে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে, থাকুক আমাব অনেক-অনেক দুঃখ আব দারিদ্র্য, তবু আমি বাচলুম, আমাব মতো কবে আমি এতোদিনে বাঁচলুম, বীথি।'
'কিন্তু,' বীথি তাব গলাব স্ববে যেন ভেঙে-ভেঙে পড়লো, 'তুমি, তুমি একা। পুরুষ হয়ে এমনি কবে পালিয়ে এলে, আব সমস্ত সংসাবেব ভাব কিনা আমি বয়ে বেড়াবো, দাদা?'
'বয়ে বেড়াবি নে? একশোবাব বয়ে বেড়াবি। তোব কি আছে,' হরেন ক্রুদ্ধ গলায় বললে, 'কি আছে তোব জীবনে, যাব জন্যে তুই দুই হাতে ফেলে দিতে পাববি এই আত্মপ্রবঞ্চনাব বোঝা, দাঁড়াতে পাববি তোর নিষ্ঠুবতার ঐশ্বর্যে। সামান্য একটা ডিপ্লোমা ছাড়া তোব কি আছে?'

'তোমারই বা কি ছিলো ?'

'আমার ছিলো তবু একটি স্ত্রী, একটি স্নেহ,' বীথির কাছে হরেনকে তখন যে কি কুৎসিত শোনালো তা আর খুলে বলা যায় না, 'আমার ছিলো ছোট একটি এই কুঁড়ে ঘরের স্বপ্ন। শরীরের ঐ কখানা হাড় ছাড়া তোর কি আছে ?' হরেন ব্যাকুলতায় উদ্বেল হয়ে উঠলো, 'পালা, তুই-ও পালা, বীথি। যদি বাঁচতে চাস তো এই পরিবার থেকে, এই জীবন থেকে, দীপ্ত ডানায় দীর্ঘ উড়ে পালা। তোর এমনি করে ব্যবহৃত হবার কথা নয়, বীথি, তোর বিকশিত হবার কথা। এ তুই কি হয়ে গেছিস ?'

'সম্প্রতি তোমার এই বাড়ি ছেড়েই আমাকে পালাতে হচ্ছে।' বীথি চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে পড়লো।

কিন্তু ঘরের চৌকাঠ ছেড়ে পা বাড়ায় তার সাধ্যি কি ? আঁচল দিয়ে বৌদি তাকে সাপটে ধরেছে। আশ্চর্য, তার বৌদি! সেই ছয়ছোট্ট, মিরকুটে একটা খুকি! কিন্তু শত হাত বাড়ালেও আজ আর তুমি তার নাগাল পাচ্ছ না। সেই সেদিনের অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ একটা মেয়ে। একান্ত মেয়ে হওয়াতেই যার পরিসমাপ্তি। একদিন যাকে দেখে তোমার করুণা করতে ইচ্ছে হয়েছিলো। যার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তুমি তার হয়ে আগেই অনুতাপ করে নিয়েছিলে। ঘৃণায় যাকে তুমি সেদিন স্পর্শ পর্যন্ত করোনি। কিন্তু আজ সে তোমাকে একটি মাত্র ধাপে কতোদূর ছাড়িয়ে গেছে। লঙ্ঘন করে গেছে কতো বিশাল সমুদ্র!

'আর এই দেখছ ঠাকুরঝি, কেমন সুন্দর একটি বাগান করেছি। কেমন নিচু করে গাছের ঝুরিতে নরম একটি দোলনা দিয়েছি ঝুলিয়ে। বিকেলে যখন ছায়া পড়বে, তখন এটায় বসে দোল খেয়ো, কিছু ভয় নেই, ছিঁড়ে পড়বে না—এই দেখ না, দুলতে-দুলতে দিব্যি তুমি বই পড়তে পারবে, ঠাকুরঝি।'

আশ্চর্য, তাব সঙ্গে কথা বলতে বৌদিব আব সেই সভয় সম্ভ্রমটুকুও দেখা যাচ্ছে না। ববং সে-ই যেন এখন উঠে এসেছে মহিমাব চূডায, কোন অস্পৃশনীয় সৌন্দর্যেব আকাশে।

সব আমাব নিজেব হাতে কবা। এই একটুকবো আনাজেব ক্ষেত, এই ঘুঁটেব পাহাড। বন্দেজি না কবলে চলবে কি কবে?'

সে সুন্দব নয়, বলো, সে সুখী নয় তাব পৃথিবীতে। বলো সে হোয়াইটহেড পডেনি।

তালা খুলে বীথি আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকলো। গুহার আড়ালে হিংস্র একটা পশুর মতো একতাল জমাট অন্ধকার তার জন্যে ওৎ পেতে আছে। সে-অন্ধকার কালো একটা অস্তিত্ব নয়, সে-অন্ধকার একটা সুশুভ্র শূন্যতা। সে-অন্ধকার তার ক্লান্তিহীন, দীর্ঘ একটি নির্জনতা দিয়ে তৈরি। সে-অন্ধকার তার মনের, তার গূঢ়, ঘন, অনুদ্ঘাটিত শরীরের অন্ধকার।

দেহ-মনের সেই অন্ধকারে বসে বীথির নিজেকে ভারি একা মনে হলো— ঈশ্বরের মতো একা। আর সেই নিঃসঙ্গতম মুহূর্তে, কেন কে বলবে, হঠাৎ তার আজকে একটি কবিতা লিখতে ইচ্ছে করলো—আজ, এতোদিনে।

ইলেকট্রিক আলোটা নিবিয়ে সে নরম মোম জ্বালালো—তার শরীরের পাণ্ডুর একটি বিষণ্ণতা। দেয়ালের শুভ্র স্তব্ধতা দিয়ে ঘন করে তুললো তার আত্মার উপস্থিতি। দূরের জানলা একটা খুলে দিলো। দেরাজ থেকে বার করে নিলো একটা কলম আর খাতা। উপুড় হয়ে ভেঙে পড়লো তার বিছানায়, তার সেই সোফার মতো বিছানায়। তারপর তার সেই স্তব্ধতার অন্ধকারে সে কলম ডোবালো।

বলতে পারো আজ সে কি নিয়ে কবিতা লিখছে ?

গ্রীষ্মের এই নীল মধ্যরাত্রি নিয়ে? তার এই অপরিমাণ নির্জনতা নিয়ে ? নিয়ে তার এই অসামান্য অক্লান্তি ?

নয়, নয়, তোমরা তা ভাবতেও পারো না, সে পরিপূর্ণ একটি প্রেমের কবিতা লিখলো।

আজ তাকে তা লিখতে দাও।

তোমরা ভয়ানক অবাক হয়ে যাবে, বিশ্বাস করতে চাইবে না, বলবে : জীবনে তুমি কোনোদিন কাউকে ভালোবাসলে না, বীথি, জানলে না কাকে বলে প্রেম, বা তাকেই সত্যি প্রেম বলে কিনা, এ তোমার কি অন্যায় স্পর্ধা! আন্তরিকতা নেই, সত্যানুভূতি নেই—একে তুমি কবিতা বলো কি করে ?

হায়, প্রেম যারা করলো, তারাও তো প্রেমকে জানলো না।

আর তুমি আনন্দে না আন্তরিক হতে পারো, কথা দিয়ে আর্তনাদকে আড়াল করে রাখো তোমার সাধ্য কি! আনন্দে তুমি বন্য হতে পারো না, তোমার সভ্যতা, তোমার ভদ্রতা তাকে সীমার মধ্যে এনে শাসন করবে। কিন্তু যন্ত্রণার বেলায় তুমি পাশবিক। যখন তোমার মর্মমূলে তীক্ষ্ণ একটা বাণ এসে বিদ্ধ হয়, তখন আর্তনাদে তুমি একেবারে উলঙ্গ হয়ে ওঠো। কোনো সভ্যতাই তোমার সেই আর্তনাদকে তখন চাপা দিতে পারে না।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, তোমার প্রেম কোথায় ?

জীবনে যা সে পায়নি তারই নাম প্রেম। একদিন তার দুয়ার থেকে যাকে সে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, সে সেদিন তার প্রেমকেই তাড়িয়ে দিয়েছিলো।

শুধু কি তার ভাব থেকে প্রেম আসে নাকি, তার অভাব থেকে আসতে পারে না ? ঈশ্বরকে দেখা যায় না বলেই কি আর সে ঈশ্বর নয় ? প্রেমকে জানা গেলো না বলেই কি সে পরমতম প্রেম নয় বীথির জীবনে ?

বীথি প্রেমের কবিতা লিখলে—যা কোনোদিন সে পায়নি, যা সে পেতে পারতো, যা সে হয়তো পাবে না কোনোদিন, সেই প্রেমের কবিতা।

এবং আরো আশ্চর্য, তাতে, একটি শব্দেও, সে নিজেকে ভুলতে পারলো না, ভুলতে পারলো না তার আর্তনাদে দীপ্যমান এই শরীরের সৌন্দর্য। সে আর প্রকৃতি নিয়ে লিখছে না, মনে রেখো, সে প্রেম নিয়ে লিখছে।

এতোদিনে সে তার কল্পনায় পেয়েছে মুক্তি, তার রক্তে পেয়েছে তীব্রতা। এ প্রেম তার শরীরের স্তব, তার ইন্দ্রিয়ের আরতি, এ তার রক্তের রশ্মিচ্ছটা। আকাশময় হাহাকারের মতো একে সে শব্দের তারায় বিকীর্ণ করে দেবে। এ কথা উচ্চারণ না করা পর্যন্ত সে বাঁচবে না কিছুতেই।

কবিতা যখন সে একটা লিখেই ফেললো, তখন সেটা সে ছাপাবে, একা সে এতো সুখ সহ্য করতে পারবে না, নিয়ে যাবে সেটাকে সে অপরিচিত মানুষের সহানুভূতির তাপমণ্ডলে।

কোনো মেয়ে প্রেম একটা করতে পারলো বলে নয়, প্রেম নিয়ে মহীয়ান একটা কবিতা লিখতে পারলো—সেই বিস্ময়কর কীর্তির কাহিনী। তারপর একবার যখন বাঁধ গেলো ভেঙে, রাশি রাশি আর্তনাদের বন্যা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করে তুললো।

রোজ রাত্রে বীথির ঘরে, অপরিসর সেই বিছানার পাশটিতে, মোম বাতির নরম, ক্ষীণ ম্রিয়মাণতায় তার অজ্ঞাত প্রেম এসে দেখা দেয়। তার শরীরের সঞ্চিত নিঃসঙ্গতা থেকে আরক্তিম একটি ফুল ওঠে বিকশিত হয়ে। শরীরের স্নায়ু শিরাগুলি বহুতন্ত্রিক বীণার তারের মতো সন্ধ্যায় গীতিমান হয়ে ওঠে।

এতোদিনে তবু সে যেন একটা কিছু পেলো। তার নিজেকে নিয়ে এই নিরাবরণ নির্মিতি। তার এই অলৌকিক অতিক্রান্ততা।

লেখাগুলি সত্যি ভালো হয়েছে বলে, না, সেই নিতান্ত মেয়ে হয়েছে বলে কে জানে, কবিতাগুলি তার হু হু করে ছাপা হতে লাগলো। তার শরীরের বিদ্যমানতার মতো নিজের নামটাও সে গোপন করলো না।

কেউ কেউ অবিশ্যি কোনো কোনো কবিতা ফেরত দিলে, কেউ কেউ বা সেগুলি ছাপলো পাইকা অক্ষরে, প্রথম পৃষ্ঠায়। একের যা খেলনা, তাই আবার অপরের মৃত্যু।

কিন্তু দিন যতোই যাচ্ছে, বীথি দুই হাতে গুনে আর কুলোতে পারছে না, তার এতো আত্মীয় এতোদিন ছিলো কোথায়? এবং মায়ের পেট থেকে পড়েই সবাই এক একটি দুর্ধর্ষ অহীরাবণ!

রেঙ্গুন থেকে বড়দিদি কতোদিন বাদে বীথিকে একটা চিঠি লিখলেন। লিখলেন:

'চাঁদের আলো'-কাগজে সেদিন একটা কবিতা পড়লুম, নিচে নাম দেখলুম তোর। সত্যি, ওটা তোর লেখা, তোর হাত দিয়ে ওটা বেরিয়েছে? তোর জামাইবাবু শত জোর দিয়ে বললেও আমি কিছুতেই তা মানতে রাজি নই। কোনো কুমারী ভদ্র মেয়ে 'আমি' 'আমি' করে অমন সব জঘন্য কথা ছাপা'র অক্ষরে লিখতে পারে এ আমি নিজের চোখে বহুবার পড়েও বিশ্বাস করতে পারছি না। ফেরত-ডাকে জবাব দিবি, এ যদি সত্যি তোর লেখা হয় বীথি, ঐ সংখ্যার কাগজটা আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

তার নন্ত-কাকা, কোনোদিন যিনি তাদের পরিবার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আত্মীয়তা দেখাননি, আজকে হঠাৎ বরিশালের কোন গ্রামে বসে তার জন্যে ভীষণ ভাবিত হয়ে পড়েছেন:

'তোমার চরিত্রের এই অধঃপতন দেখে মর্মাহত হলুম। তোমার এখনো বিয়ে হয়নি, কিন্তু তোমার মুখে এ-সব কি কুৎসিত কাতরোক্তি! প্রেম—প্রেম ছাড়া কি মানুষের আর কিছু লেখবার নেই?'

মামাবাবু তো মরিয়া হয়ে তার মুখের উপর রুখে এলেন: 'তোর জন্যে আমি প্রায় এক বিলেত-ফেরত পাত্র ঠিক করেছিলুম, কিন্তু এ সব তুই কি লিখেছিস কবিতা করে? এর পর তোর এই সব কীর্তি জেনে তোকে কেউ আর বিয়ে করতে রাজি হবে নাকি ভেবেছিস?'

মামিমা তপ্ত তেলে ফোড়ন দিলেন, 'ধরে-বেঁধে বিয়ে একটা কেউ দিলে না বলেই তো মেয়েকে শেষকালে কীর্তি করতে হচ্ছে।' বীথির দিকে

চেয়ে বললেন, 'যাকে ভালোবেসেছিস, তাকেই বিয়ে করে ফ্যাল্ না বাপু, বিয়ে হয়ে গেলে তবু যেন তা সওয়া যায়, নইলে এ কি অনাছিষ্টি কাণ্ড।'

'কাকে ভালোবেসেছিস?' মামাবাবু তিক্তমুখে গর্জন করে উঠলেন।

বীথি বোকার মতো চারদিকে চাইতে লাগলো।

'তা কি করবে বলো!' সমবেদনায় মামিমার মুখ থমথমে হয়ে উঠলো, 'বিয়ে যখন হচ্ছেই না, তখন বুদ্ধিমানের মতো কবিতায় লোক যোগাড় করতে বেরিয়েছে। উপায় কি তা ছাড়া! তবু যদি কারুর হুঁস হয়। কি জানি লিখেছিস সেই কবিতাটা, মনেও নেই ছাই আগাগোড়া—সেই যে, তুমি এসো, তুমি এসে তোমার একটি স্পর্শে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দাও—' মামিমা হঠাৎ হাসিতে গড়িয়ে পড়লেন, 'আজকালকার মেয়েরা কতো ঢঙের কথাই যে শিখেছে!'

হাওয়ায় আর বীথির কান পাতবার জো নেই। প্রতিটি পাতার মর্মরে, প্রতিটি মানুষের নিশ্বাসে সে তার চরিত্রহানির খবর শুনছে। মেয়ে হয়ে যখন সে প্রেমের কবিতা লিখলো, তখন তো সে শরীরে-মনে অশুচিই হয়ে গেছে ধরতে হবে। তোমার শরীরকেই শুধু আবৃত করে রাখলে চলবে না, তোমার মনকেও রাখতে হবে মৌনী করে।

তারপর বিনায়কবাবুর চিঠি এলো। বীথি উঠলো উৎফুল্ল হয়ে।

কিন্তু প্রথম লাইনেই সে প্রচণ্ড একটা হোঁচট খেলে।

বিনায়কবাবু লিখছেন:

তোমার কাছ থেকে এ আমি কখনো আশা করতে পারিনি বীথি। আগে-আগে তোমার কবিতায় কতো চমৎকার প্রকৃতি-বর্ণনা থাকতো, কতো ঐশ্বরিক ভাব, কতো সুন্দর সদুপদেশ—তুমি আজকাল সে-সব মহান গুণ নির্বিবাদে বর্জন করেছ। সব চেয়ে অবাক হচ্ছি, তুমি আজকাল ছন্দ মিলিয়ে পর্যন্ত লিখছ না। তোমার ওগুলি গদ্য না কবিতা

এ-জ্ঞান আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। ভাষায়, ভাবে, এমন কি ছন্দে পর্যন্ত তোমার অমিতাচার দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশের বড়ো-বড়ো মহিলা-কবির নাম করো, মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়, কেউ তোমার মতো এমন অশোভন ও অসঙ্গত বিদ্রোহ করেননি, সবাই কেমন স্বচ্ছ ভাষায় স্নিগ্ধ উপদেশ বিতরণ করে এসেছেন। তাঁদের একজন হয়ে মাঝখান থেকে তুমি এমন হতবুদ্ধি হতে গেলে কেন? তোমার ভয় করলো না?

কেউ তোমাকে ভালো বলছে না। তোমার চোখে পঁড়েছে কিনা জানি না, কলকাতারই কতোগুলি কাগজ তোমার কবিতা নিয়ে যাচ্ছেতাই কটু-কাটব্য করে আমাকে কাটিংস পাঠিয়েছে। লজ্জায় আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারছি না। তোমার সুনাম নিয়ে নানা জনে নানা রকম কথা বলতে শুরু করেছে। তোমার মা তো রাত্রে দুচোখ একত্র করতে পারছেন না। ও-সব কবিতা তুমি কেন লিখতে গেলে, বীথি?

এতো লেখাপড়া তোমাকে তবে শেখালুম কেন? তুমি কি আজও বুঝলে না পৃথিবীতে সেই কাব্যই অমর যাতে ঐশ্বরিক ভাব থাকে, যাতে থাকে সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা। তুমি কিনা সেই উচ্চাদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিম্নস্তরের কতোগুলি প্রবৃত্তি নিয়ে ভাষার ব্যভিচার করছ। তোমার এই অবনতি আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না, বীথি। কবিতা তুমি লেখ, কে তা বারণ করছে, কিন্তু এমন কবিতা লেখ যা পড়ে লোকে উন্নত হতে পারে, শোকতাপ ভুলতে পারে, ঈশ্বরের কাছাকাছি আসতে পারে। এমন কবিতা লেখ যা প্রতি ঘরে-ঘরে ছেলেমেয়েরা সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশান-এ যেতে পারে—আমি তা নিজের খরচে ছাপিয়ে টেক্সট-বুক-কমিটি থেকে এ্যাপ্রুভ করিয়ে নেবো। সেই সব চেষ্টা না করে তুমি কিনা এমন সব অকথ্য কবিতা

লিখছ যা ভদ্রলোকের পাতে দেয়া দূরে থাক, আমাদেরই মাথা কাটা যাচ্ছে।

শোনো বীথি, তোমার এই অমূল্য সময় এমনি করে অপব্যয় করবার কথা নয়—তোমার সামনে কতো বড়ো কর্তব্য পড়ে আছে। তুমি তা পালন করতে পারবে বলেই তোমাকে এতো উপযুক্ত করে তুলেছিলুম—দিয়েছিলুম তোমাকে এতো উন্মুক্ত স্বাধীনতা। এখনো বিশ্বাস করি, তুচ্ছ কতোগুলি ভাবপ্রবণ বিলাসিতায় তুমি নিজেকে ক্ষয় করবে না, সেই স্বাধীনতার সম্মান রাখতে পারবে। আমাদের দিকে মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখো, আমরা সংসারে যাতে ছোট হয়ে যাই তুমি কি তাই কামনা করো ?

যুদ্ধে যে নেমেছে তার কি কখনো বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে থাকলে চলে ? তোমার জয়ী হবার কথা, যশস্বী হবার কথা। তোমার কেন এই অস্বাস্থ্যকর সম্মোহন আসবে ?

আমার বেশি লেখা ধৃষ্টতা মনে করতে পারো। হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করছি, বীথি। তুমি বড়ো হয়ে উঠেছ, চিন্তা করে দেখলে তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। পাঁচজনের কথা আমি কিছু বিশ্বাস করি না, কেননা আমি জানি তুমি সেই জাতের জলীয় মেয়ে নও, তোমার সবল একটা মেরুদণ্ড আছে, কিন্তু তবু পাঁচজনে যাতে ভালোই বলে, তাই কি আমাদের কাম্য হওয়া উচিত নয় ?

চিঠি পড়া সাঙ্গ করে বীথি জানলায় এসে দাঁড়ালো। তার চোখের জলে সমস্ত আকাশ যেন হঠাৎ মুছে গেছে।

কিন্তু কতোক্ষণ তুমি কাঁদতে পারো ? তোমাকে এখন ইস্কুলে যেতে হবে না ?

ছি-ছি-ছি—দেয়ালগুলো পর্যন্ত তাকে দাঁত বার করে ধিক্কার দিয়ে উঠলো।

সকল কাজকর্ম ফেলে বীথি কিনা এখন কাঁদতে বসেছে? যুদ্ধে যে নামলো তার ক্ষতমুখে অনর্গল রক্ত না বেরিয়ে চোখে কিনা সামান্য ক'টা চোখের জলের ফোঁটা! বীথি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একা ঘরে তার নিজের চোখে জল দেখতে পেয়ে তার ভীষণ ভয় করছে।

কিন্তু, আশ্চর্য, মেজদির তো কই একটাও চিঠি এলো না।

না, তা-ও এলো বৈকি একদিন। লিখেছে—ছোট্ট একটি পোস্ট-কার্ডে ·
আমরা কদিন হলো বদ্‌লি হয়ে এখানে এসেছি, বীথি। সময় পেলে উপরের ঠিকানায় এসে একদিন দেখা করে যাস।

ঠিকানা চিনে বাড়ি গিয়ে বীথি দেখে—বাড়িতে মেজদিরা কেউ নেই। চাকরটা বললে, 'মা আর বাবু খোকা আর খুকুমণি সমেত বায়স্কোপ দেখতে গেছেন। ট্যাক্সি করে যখন গেছেন, তখন এই ফিরলেন বলে।'

যেন তার কবিতার চেয়েও এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার, এমনি বিস্ময়ে বীথি চাকরটার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

'মা আর বাবু খোকা আর খুকুকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে গেছেন'—ঘর-দোরের সমস্ত চেহারাও সেই কথাই বলছে বটে।

একটেরে ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ি, সব মিলে তার ঘরটার চেয়েও হয়তো ছোট—বীথি খুঁটে খুঁটে দেখে শেষ করতে পারছে না, কদিনে মেজদি সমস্ত কি রকম নিখুঁত গুছিয়ে নিয়েছে—কিন্তু দেখে ও শুনে, ছুঁয়ে ও শুঁকে, স্পষ্ট সে অনুভব করতে পারছে, জামাইবাবু আর মেজদি আজ একসঙ্গে ট্যাক্সি করে বায়স্কোপ দেখতেই গিয়ে থাকবেন।

'ওমা, বীথি যে! অনেকক্ষণ ধরে বসে আছিস বুঝি?' শাড়িতে-গয়নায় মেজদি ঝলমল করে উঠলো, 'কি করবো, ওর আজকে ভারি শখ হলো, কি নাকি কোথায় একটা নতুন বায়স্কোপ এসেছে, আমাকে নিয়ে যাবেন দেখাতে। কেমন আছিস তুই?'

'যেমন দেখছ,' বীথি হাসিমুখে বললে, 'তা হলে জামাইবাবু আজকাল তোমাকে সটান বায়স্কোপ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে?'
চোখের কোণে মেজদি তার ইশারাটা ধরে ফেললো , লজ্জায় একটু ঝিলিক দিয়ে বললে, 'না নিয়ে গিয়ে উপায় কি! যাবে কোথায়? দুটো লোক পাশাপাশি থেকে কতোদিন আর মারামারি করতে পারে বল?'
'এটা কি করে সম্ভব হলো, মেজদি?'
'দেখছিস না আমি এখন কেমন মা হয়েছি!' মেজদি তার কোলের মেয়ের দিকে বিহ্বল চোখে তাকালো, 'দেখছিস না কেমন ছোট্ট একটা আলাদা বাসা নিয়েছি দুজনে এখানে! ওঁর বদলি হওয়াতেই বেঁচে গেলুম, বীথি,' মেজদি গলাটাকে ধূসর করে তুললো, 'দেখছিস না শাশুড়িদের কাউকেই আনিনি সঙ্গে করে। তুলে তুলে মাস-মাস খরচ দেয়াও ভালো, তবু বাপু আর পাঁচজনের মধ্যে একসঙ্গে থাকা নয়। এখন বায়স্কোপ যাওয়া আমার কে আটকায়?'
মেজদি হাসিতে উছলে উঠলো, 'এখন আর কার সাধ্যি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে? ঝগড়া করলে তাকে রান্না করে দেবে কে? এখন যদি একবার দেখিস বীথি, তার তোয়াজের ঘটা'—মেজদি টানতে টানতে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে এলো, 'নামও শুনিনি ভাই কতো বাজ্যের গন্ধ আর তেল, স্নো আর পাউডার। একটু হেচেছি কি অমনি এসে গেলো ডাক্তার। তোকে বলতে লজ্জা নেই বীথি, শুধু ঐ শাশুড়ির জন্যেই এতোদিন তিনি আমাকে ভালোবাসতে পারেননি। নির্জন না হলে কখনো প্রেম জমে?'
চাকর খুকির জন্যে বোতলে করে গরম দুধ নিয়ে এলো।
মেজদি নিজেকে হঠাৎ সংশোধন করলে, 'আমি কেবল নিজের কথাই পাঁচ কাহন বলে যাচ্ছি। তারপর তোর কি খবর?'

'আমি যে কতোগুলি প্রেমের কবিতা লিখেছি তা তুমি এখনো পড়োনি, মেজদি?' বীথি আকর্ণ রঙিন হয়ে জিগগেস করলে।

'কিসের কবিতা?'

'প্রেমের।'

মেজদি হঠাৎ হেসে ছিটিয়ে পড়লো চারদিকে, 'তুই—এখনো তোর বিয়ে হয়নি, তুই প্রেমের কি জানিস, পোড়ারমুখি?'

'জানি না বলেই তো মুখ পুড়িয়ে লিখতে গেছলুম।' বীথি হাসতে পারলো না, 'তুমি পড়োনি তা? বাড়ির ছাদটা ভেঙে পড়েনি তোমার মাথার ওপর?'

বোতলের রবারটা দেখিয়ে খুকিকে লুব্ধ করতে-করতে মেজদি বললে, 'রক্ষে কর্। জলজ্যান্ত একটা প্রেম করেই সময় পাচ্ছি না, এখন আমি ঠাট করে কবিতা পড়তে বসি। তোরা বিদ্যানি হয়েছিস, তোদের কথা আলাদা—তোদের সঙ্গে আমরা পারবো কেন? আদার বেপারি জাহাজের খবর রাখবো কোত্থেকে? তুই বরং ওকে একটু ধর্, বীথি, আমি তোকে চা করে দি।'

খুকিকে কোলে নিয়ে বীথি আদর করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু দুরন্ত খুকি তাকে মোটেই চেনে না, তার কোল থেকে নেমে যাবার জন্যে সবলে সে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করেছে।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে মেজদির প্রসারিত হাতের মধ্যে ওকে ছেড়ে দিয়ে বীথি গা ঝাড়া দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। বললে, 'বাবাঃ, আমার সাধ্যি ওকে ঠাণ্ডা করে রাখা! দেখ, কোথায় ধরতে ওর কোন হাড়টা কোথায় মটকে দিয়েছি। বাবাঃ, আমাকে কখনো এ সব শোভা পায়? ছোট ছেলে-মেয়ে কোলে করলে আমার গা-টা এমন ঘিনঘিন করে।'

মেজদি সন্তানগর্বে বিস্ফারিত হয়ে বললেন, ‘নিজের মেয়ে হলেই দেখা যাবে।’

‘রক্ষে করো,’ বীথি মেজদির পাশ ঘেঁষে বসে পড়লো, ‘পরের মেয়ে হয়েই চোখে-মুখে পথ পাচ্ছি না, তার আবার নিজের মেয়ে।’

তারপর বীথি 'ভারতীয় নারীর পুণ্য আদর্শ' সম্বন্ধে অভ্রভেদী একটা প্রবন্ধ লিখলে। ভূদেব মুখুজ্জেও তার ধারে-কাছে এসে দাঁড়াতে পারলো না। বিনায়কবাবু আহ্লাদে একেবারে গলে গেলেন। সর্বাণী শোকশয্যা নিয়েছিলেন, তিনিও উঠে বসে তুলে নিলেন মাসিক-পত্রটা। হ্যাঁ, একেই তো বলে লেখার মতো লেখা, কি ভাষার ওজস্বিতা, কি গাম্ভীর্য! এই সব ভালো ভালো আইডিয়া ছেড়ে ও কিনা গেছলো কবিতা লিখতে। সর্বাণী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তুমিই তো চিরকাল ওকে খেপিয়ে এসেছ।'

'সে কোন ছেলেবেলাকার কথা! আর কবিতা লিখতে উৎসাহ দিয়েছিলুম ভবিষ্যতে একদিন এমনি ভালো গদ্য লিখতে পারবে বলে। কবিতা যে লেখে, পরে সে ইচ্ছে করলেই ঝরঝর করে গদ্য লিখতে পারে, কিন্তু গদ্য যে লেখে, সে সব সময় না ও লিখতে পারে কবিতা। দেখলে তো, ওর মধ্যে কতো জিনিস ছিলো,' বিনায়কবাবু ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলেন, 'এই আর্টিকেলটা পড়ে বার-লাইব্রেরিতে কেমন একটা বেশ সোরগোল পড়ে গেছে—সীতারামবাবু তো তাঁর মেয়ের জন্যে শাদা কাগজে খানিকটা টুকে নিলেন—সেই জায়গাটা গো, যেখানে স্বামীর জন্যে শৈব্যা বিশ্বামিত্রের কাছে আত্ম বিক্রয় করছে। এখন সবাই কতো প্রশংসা করছে ওকে, একবাক্যে বলছে, মেয়ে তোমার একখানা ভাষা শিখেছিলো বটে, কি ফ্লো, কি ফ্লেভার! আমি ভাবছি কি জানো, আমাদের এখানকার লাইব্রেরি থেকে শিশু পালন নিয়ে রচনা-প্রতিযোগিতা হচ্ছে, মেয়েদের লেখা, যে ফার্স্ট হবে সে একটা রূপোর মেডেল পাবে—আমি বীথিকে

আজই একটা চিঠি দি, ও-ও একটা লিখে পাঠাক। দেখো, নির্ঘাৎ ও ফার্স্ট হবে। এমন ওব ভাষা।'

বিনায়কবাবু বীথিকে সেই মর্মে একখানা চিঠি লিখলেন। খুচবো কয়েকটা পয়েণ্টও দিয়ে দিলেন গায়ে পড়ে।

বিছানায় শুয়ে বীথি শূন্য চোখে চিঠিটাব দিকে চেয়ে ছিলো।

'বাবাঃ, কতোক্ষণ ধরে দরজায় নক্ কবছি। তোমার আব খোলবার নাম নেই,' টুকু দীপ্ত মুখে ঘবে ঢুকলো, 'কবিতা লিখছিলে বুঝি ?'

বীথি আবাব তাব বিছানায় গিয়ে বসলো। ক্লান্ত গলায় বললে, 'শবীবটা ভালো নেই, টুকু-দা, বিছানায় এমনি শুয়ে ছিলুম, উঠতে ইচ্ছে কবছিলো না।'

'কেন, কি হযেছে ?'

'কেমন জ্বব-জ্বব কবছে।'

'কবিদেব এক-আধটু জ্বব হওয়া ভালো,' টুকু ভুরুটা একটু তেবছা করলো, 'গায়ে একটু জ্বব থাকলেই নাকি কবিদেব মনে ইনস্পিবেশান আসে।'

'আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি, টুকু-দা।'

'ছেড়ে দিয়েছ ? কেন ?'

'তোমাব সেই নির্মম উক্তিটা চিবকালেব জন্যে সপ্রমাণ কবে দিতে,' বীথি ঠাণ্ডা, মরা গলায় বললে, 'যে, বাঙলা দেশে কোনো কালে সত্যিকাবেব মেয়ে-কবি জন্মাতে পাববে না।'

'কোনো কালে পাবেনি বলে তুমি হতে পাববে না কি ?' টুকু চেয়াবেব মধ্যে ছটফট কবে উঠলো, 'তুমি লেখা ছেড়ে দিতে যাবে কেন ? তোমাব কি দুঃখ !'

বিমর্ষ চোখেব পাতা দুটি একটু কাঁপিয়ে বীথি করুণ কবে বললে, 'লোকে ভালো বলে না যে।'

'সেই জন্যেই তো তোমাকে আরো বেশি করে লিখতে হবে।' টুকু শিখার মতো সমস্ত শরীরে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, 'লোকে যে ভালো বলে না সেইখানেই তো তোমার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে, বীথি।'

'পাগল। আমরা যে মেয়ে।' বীথি দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে ভঙ্গিটা দুর্বল করে আনলো, 'কবিত্বের চেয়ে সতীত্ব আমাদের বড়ো জিনিস, টুকু-দা। আমাদের নামের দরকার নেই, আমাদের সুনামের দরকার। আমরা তেমন কোনো জিনিস লিখতে পারি না যাতে লোকে আমাদের চরিত্রে দোষারোপ করতে পারে। তাই আমরা মেয়েদের মতোই লিখতে পারি টুকু-দা, মানুষের মতো পারি না।'

টুকু তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

'সেই জন্যেই বাঙলা-দেশে কোনো মেয়ে-কবি জন্মালো না,' বীথি ছায়ার মতো বিবর্ণ গলায় বলতে লাগলো, 'একে তো আমাদের নিজেদের বলে আলাদা একটা ঘর নেই, তায় নেই টাকা—বাপের যদি সম্পত্তি থাকে, সে-সম্পত্তি পর্যন্ত আমি পাবো না—তায় আবার এই সতীত্বের অত্যাচার। বড়ো কবিতা কি করে হবে, টুকু-দা—টবে কখনো ফুলের মতো ফুল ফোটে, শাসনে কখনো আর্ট? আমি ভালোবাসি—এই সামান্য কথাটা সহজ, সবল, সত্যবিশ্বাসে, বুক ভরে, সমস্ত দেহ-প্রাণ দিয়ে কোনো মেয়ে বলতে পেরেছে কোনোদিন? কি করেই বা পারবে? চারদিকে সতীত্ব রয়েছে যে সঙিন উঁচিয়ে।'

বীথি আস্তে-আস্তে বালিসে ভেঙে পড়লো। বললে, 'শুধু আমাদের দেশে কেন, মনে হয় ইংলণ্ডেও একদিন ছিলো, এবং সেটা বেশি দিনের কথা নয়। মনে হয়, সতীত্বের ভয়ে সে-দেশের মেয়ে-প্রতিভাও একদিন কুঁকড়ে ছিলো, টুকু-দা। নইলে বলো, শার্লট ব্রঁতে কেন কারার বেল নাম নিতে যাবে, মেরি ইভান্স কেন লিখতে যাবে জর্জ এলিয়ট-এর ছদ্মনামে?'

টুকু আমতা-আমতা করে বললে, 'কিন্তু সেই যুগেই এলিজাবেথ ব্যারেট নামে আরেকটি মেয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'বোলো না, ব্যারেটের কথা বোলো না।' বীথি বালিসে হঠাৎ মুখ লুকোলো, 'তার ব্রাউনিং ছিলো। দুর্দাম, দুর্ধর্ষ ব্রাউনিং। ব্রাউনিং না থাকলে সে-ও বাঁচতো না, টুকু-দা। নইলে, জানো তো তারও একজন বাপ ছিলো, আর সে কি কালাপাহাড় বাপ, মেয়ে পোর্ট খাবে না, তবু সে তাকে জোর করে পোর্ট খাওয়াবে, ডাক্তারেরা তাকে হাওয়া বদলাতে ইটালি যেতে বলছে, তবু সে তাকে জোর করে উইম্পোল স্ট্রিটেই আটকে রাখবে—ব্রাউনিং ছাড়া সে মুক্তি পেতো না, প্রেম পেয়ে তার এতোদিনের একটা দুরারোগ্য অসুখ পর্যন্ত সেরে গেলো।'

'কিন্তু তোমারও বা কি ভয়।' টুকু দৃঢ়, স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, 'তুমিও তো পেয়ে গেছ তোমার স্বাধীনতা।'

'একে স্বাধীনতা বোলো না, টুকু দা। ফাঁকায় গিয়ে গায়ে খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে এলেই সেটাকে স্বাধীন হওয়া বলে না।'

'তাই বলে তুমি আর লিখবে না, বীথি ?' টুকু ঝলসে উঠলো।

'না, লিখবো বৈকি।'

'কি লিখবে ?'

'প্রবন্ধ লিখবো।'

'তাই লেখো।' টুকু চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলো, 'এমন প্রবন্ধ লেখো যা পড়ে তোমার ঐ লোকগুলো, সেই একতাল মৃত মূর্খতা, সমস্ত শরীরে বিছুটির বাড়ি খেয়ে চিড়বিড় করে ওঠে। রাগে, আপাদমস্তক চটে ওঠে। বীথি, রাগ একটা মানুষের স্বাস্থ্যকর সঞ্চালন সেই রাগে, সেই ঘৃণায় তোমার কলম তলোয়ারের চেয়েও ধারালো হয়ে উঠুক। প্রেম নিয়ে না লেখো, ঘৃণা নিয়ে লেখো, ঘা মেরে মেরে ওদের তুমি বাঁচাও।'

বীথি শান্ত, নিরুদ্বেগ গলায় বললে, 'আমি শিশুপালন নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখবো, টুকু-দা।'

প্রথম ঘা-টা টুকুকেই নিতে হলো দেখছি। শূন্য গলায় জিগগেস করলে, 'কি নিয়ে লিখবে?'

'শিশু-পালন নিয়ে।'

'শি-শু-পা-ল-ন?'

'হ্যাঁ।'

টুকু হাসবে না কাঁদবে কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। বললে, 'তুমি শিশু-পালনের কি জানো?'

বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বীথি কি রকম করে যেন হেসে উঠলো, 'আমি প্রেমেরই বা কি জানতুম?'

'তুমি নিশ্চয়ই ভুল বকছ, বীথি।' টুকু এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো, 'তোমার জ্বরটা নিশ্চয়ই বেড়েছে।'

'মোটেই নয়,' মসৃণ দাঁতে বীথি পরিচ্ছন্ন হেসে উঠলো, 'শিশু-পালন নিয়ে ভালো প্রবন্ধ লিখতে পারলে আস্ত একটা মেডেল পাওয়া যাবে, প্রেম নিয়ে কবিতা লিখলে দুর্নাম ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না।'

'যা বলেছি, বীথি,' টুকু এগিয়ে এসে বীথির কপালে হাত রাখলো, 'তোমার যে ভীষণ জ্বর। প্রায় একশো-তিন-চারের কাছাকাছি হবে। এখানে শুয়ে আছো কি?'

'তবে আমাকে কি করতে হবে?' পায়ের তলা থেকে মোটা চাদরটা বীথি গায়ের উপর টেনে দিলো।

টুকু ব্যাকুল হয়ে বললে, 'বাড়ি চলো। এ কি ভয়ানক কাণ্ড!'

'থাক, আমাকে নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।' ছলছলে চোখ তুলে বীথি টুকুর দিকে একবার তাকালো, 'আমি এখন স্বাধীন হয়েছি না?'

'যাই, বাবাকে খবর দিই গে।' টুকু এক পায়ে এগোতে গেলো, আরেক পায়ে রইলো থেমে।

'খবরদার, টুকু-দা,' বীথি প্রখর গলায় পরিষ্কার ধমকে উঠলো, 'তোমাকে গিয়ে সর্দারি করতে হবে না। সবাই মিলে আমাকে নিয়ে যে কেবল আলোচনা করবে, এ আমি আর সহ্য করতে পারবো না বলে রাখছি। বাঁচবার স্বাধীনতা না থাকে, জোর করে তোমরা কারুর মরবার স্বাধীনতাও কেড়ে রাখতে পারো নাকি ? যাও, বাড়ি যাও, এখানে দাঁড়িয়ে আছো কি বোকার মতো ?' বীথি চাদরটা মাথার ওপর দিয়ে টেনে দিলো।

টুকু কিছুই হদিস করতে পারলো না।

চাদরের তলা থেকে বীথি আবার বললে, 'তোমাকেও গিয়ে বাবাকে খবর দিতে হবে না, টুকু-দা, দয়া করে আমার ঝিটাকে এখন একটু খবর দিলেই আমি বর্তে যাই।'

টুকু এতোক্ষণে যেন তবু একটা কিছু করবার পেয়েছে।

দবজায় কড়ার একটা মৃদু আওয়াজ হলো।
জ্বরো, তেতো গলায় বীথি জিগগেস করলো, 'কে ?'
ও-পিঠ থেকে উত্তর দেবার যেন আর কথা ওঠে না। যেন অনুমতি নেবারও কোনো দরকার নেই, এমনি ভাবে সমরেশ ঘরে ঢুকে পড়লো।
'এই যে, আপনি।' বীথি তার বিছানার সঙ্গে লেপটে মিশে গেলো, হাঁটুর কাছেকার গুটোনো চাদরটা আস্তে-আস্তে কনুই পর্যন্ত টেনে এনে নিজেকে আরো সে সঙ্কীর্ণ করে নিলে।
'শুনলুম নাকি আপনার খুব জ্বর হয়েছে ?' সমরেশ এক-পা এগিয়ে এলো।
'আপনাকে আবার কে বললে ?' বীথির স্বরে বিরক্তির ক্ষীণ একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।
'টুকু—টুকুব কাছে শুনলুম।' তার শিয়রের দিকে সমরেশ আরো একটা পা ফেললে।
'টুকু-দাব সব তাতেই বাড়াবাড়ি,' বীথির স্বর গাম্ভীর্যে অস্ফুট হয়ে এলো। সমবেশকে এবার চোখেব উপর স্পষ্ট দেখা গেলো। দুই কাঁধ প্রসারিত কবে এমন ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে যে তাকে ভয় করতে লাগলো রীতিমতো। এতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যেন হাতটা একটু বাড়িয়ে দিলেই তাকে ধরা যায়।
সমবেশ বললে, 'বাড়িতে খবর দিয়েছেন ?'
বীথি দেয়ালের দিকে আলগোছে একটু সরে গেলো, চাদরটা কাঁধ পর্যন্ত

আস্তে তুলে দিলে। বললে, 'এ আবার এমন কি একটা অসুখ যে বাড়িতে সাত-তাড়াতাড়ি খবর পাঠাতে হবে! মিছিমিছি তাঁদের ভাবিয়ে তোলা।'

'কিন্তু আপনার মামাবাড়িতে?'

'টুকু-দাকে বলে দিয়েছি মামাবাড়িতে যেন কোনো খবর না দেয়।'

'কেন?' সমরেশ অবাক হয়ে গেলো।

'কেননা', বীথি প্রায় বালিসের কানে-কানে বললে, 'কেননা সংসারে আমার কোনোকালে অসুখ হবার কথা নয়।' বীথি সমরেশের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তা হলে মুখটা এতোখানি তুলে ধরতে হয় যে তার ভীষণ লজ্জা করতে লাগলো, তেমনি কুণ্ঠিত হয়েই বললে, 'কিন্তু সটান আপনাকে গিয়ে যে সে খবর দিতে পারে সেটা ভেবে দেখিনি। এবার এলে তাকে শাসন করে দিতে হবে।'

'তাকে যতো খুশি শাসন করুন গে,' সমরেশ উদাসীনের মতো বললে, 'কিন্তু ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছিলেন?'

'কি দরকার!'

'কি দরকার মানে? আপনার আজ চার দিন ধরে সমানে জ্বর চলছে, নানারকম সিম্পটম শুনতে পাচ্ছি—'

'টুকু-দা ব্যস্ত হয়েছিলো বটে, কিন্তু তাকে আমি খুব কড়া করে ধমকে দিয়েছি,' বীথি হাসবার একটা অপার্থিব চেষ্টা করলো, 'বলে দিয়েছি, ডাক্তারের পেছনে অযথা খানিকটা বিলাসিতা করবার আমার রুচি নেই।'

'আপনার টুকু-দার মতো পৃথিবীর সমস্ত লোককে আপনি ধমকে দিতে পারেন না।' সমরেশ বুঝি খাটের ধার ঘেঁষে প্রায় সরে এলো, 'আপনার এখন জ্বর কতো?'

বীথির ভয় করতে লাগলো, ঠাণ্ডা, ভারি, নিরবয়ব একটা ভয়। এর আগে

আরো অনেকবার সমরেশ এখানে এসেছে, এবং এমনিই একলা, কিন্তু, আশ্চর্য, কোনোদিন নিজেকে তার এমন একলা মনে হয়নি। আর-আর দিন সে এসেছে অনুমতি নিয়ে, অনুনয়ে স্নিগ্ধ হয়ে, প্রায় কৃতার্থ হবার ভঙ্গিতে: আজকে হঠাৎ তার গায়ে এই প্রবল জ্বরের মতো জোর করে সে এসে পড়েছে, অকুণ্ঠ অধিকারের দাবিতে, প্রায় একটা সহজ অপ্রতিরোধ্যতায়। এর আগে কোনোদিন তাদের আলাপ এতো বাস্তব, এতো ব্যক্তিগত ছিলো না, বীথি তার নির্মল, নির্মম বিচ্ছিন্নতায় প্রখর, নির্দিষ্ট হয়ে থাকতো। সে-সেদিন সে ছিলো বসে বা দাঁড়িয়ে, আজ তার শুয়ে থাকার এই নিশ্চল, সমর্পিত ভঙ্গিটাই তাকে সমস্ত শরীরে দুর্বল, অসহায় করে রেখেছে। হালকা করে একটা নিশ্বাস পর্যন্ত সে ছাড়তে পারছে না। অনড় শূন্যতাটা কেমন ভার হয়ে আছে, পাচ্ছে না যেন সে তার আগেকার সেই ব্যবধানের পবিত্রতা, সেই তার ঘন, পর্যাপ্ত পরিমিতি।

শরীর থেকে নিশ্চিহ্ন মুছে গিয়ে বীথি শাদা গলায় বললে, 'জানি না। আমার এখানে থার্মোমিটার নেই।'

'যদি কিছু মনে না করেন,' সমরেশের ডান হাতের আঙুলগুলি যেন হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো, 'আপনার হাতটা একবারটি আমাকে দেখতে দেবেন?'

বীথি চাদরটা চিবুক পর্যন্ত গুটিয়ে নিলে। কবরের তলা থেকে বললে, 'আপনি কি ডাক্তার নাকি?'

'বেশ, তবে ডাক্তারকেই দেখাবেন।' সমরেশ এক লাফে দরজার কাছে সরে গেলো।

'এ কি, কোথায় চললেন?' বীথির যেন আরো বেশি ভয় করতে লাগলো।

'ডাক্তার নিয়ে আসতে।'

'ডাক্তার?'

'হ্যাঁ,' সমরেশ হাসিমুখে বললে, 'এমন ভাবে কথা বলছেন যেন আপনাকে এক্ষুনি টনসিল কাটাতে হচ্ছে।'

বীথি ভাবি, বিস্বাদ গলায় বললে, 'তাব কোনো দবকার নেই।'

'আপনার কি দরকার না-দবকাব আপনি কি সব বোঝেন নাকি?'

'তবে কি সেটা আমাব আপনাব কাছ থেকেই বুঝতে হবে?'

'দবকাব হলে তা-ও বুঝতে হবে বৈকি,' সমবেশ দবাজ গলায় বললে, 'চোখেব সামনে বিপন্ন একটা লোককে তো আর মবতে দেখতে পাবি না।'

'মরতে দেখবার জন্য কে আপনাকে এখানে নেমন্তন্ন কবে এনেছে?' বীথি ঝাঁজালো গলায় বললে, 'আপনাব নিজের কাজ দেখুন গে যান।'

সমরেশ হঠাৎ জোবে শব্দ কবে হেসে উঠলো, 'কোনটা যে কখন চোখেব নিমেষে নিজেব কাজ হয়ে ওঠে কেউ বলতে পাবে না। একটু শুয়ে থাকুন, এই কাছেই আমাব জানা ডাক্তাব আছে, আমি এখুনি গিয়ে নিয়ে আসছি। ভয় নেই।'

'সে-কথা আপনাব কাছ থেকে শোনবাব জন্যে আমি বসে ছিলুম না।' পাশেব দেয়ালটাকে বীথি সম্বোধন কবলে, 'আমাব জন্যে আপনাব অকাবণ ব্যস্ত হতে হবে না। পৃথিবীতে আমি ঠুনকো একটা কাঁচেব পেয়ালাব মতো ভেঙে যেতে আসিনি।'

'বেশ তো, অটুটই না-হয় বইলেন,' সমবেশ দবজাব বাইবে পা বাড়িয়ে বললে, 'কিন্তু ডাক্তাব নিয়ে আসতে আমাব একটুও দেবি হবে না। এই মোড়েই তো তাব ডিসপেনসাবি।'

যেমন সহজে সে এসেছিলো ততোধিক সহজে সে বেবিয়ে গেলো। এব মাঝে কোথাও সে একটা হোঁচট খেলো না।

বীথি চেঁচিয়ে উঠলো, 'শুনুন।'

সিঁড়িটা সবে ছুঁয়েছে, ডাক শুনে সমবেশ ফেব ফিরে এলো।

কিন্তু এতে ঘরের অবস্থাটা বিশেষ হালকা হয়ে উঠলো না। বীথির গা ভরে তেমনি আবার একটা বন্য ভয় করতে লাগলো। ভয়টাও একটা চমৎকার উত্তেজনা। ভয়ের মাঝেও যে এমন একটা জাদু আছে বীথি তা কোনোদিন অনুভব করেনি। কিন্তু, আশ্চর্য, ভয়-ই বা সে করতে যাবে কেন?

বীথি কঠিন হবার জন্যে উঠে বসবার ভঙ্গুর একটা চেষ্টা করলো। বললে, 'মিছিমিছি আপনি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছেন। ডাক্তার এলে আমি তাকে তক্ষুনি তাড়িয়ে দিতুম, বলতুম, যিনি আপনাকে ডেকেছেন তাঁর চিকিৎসা করুন গে।'

'আমার চিকিৎসাটা পরে হবে, কিন্তু,' সমরেশ শিয়রের দিকে দূরের বন্ধ জানলার কাছে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো, 'কিন্তু, দরজা বন্ধ করেছেন, বুঝি, বেচারা জানালাটা কি দোষ করলো?'

'তবে আমি উঠে গিয়ে ওটা খুলে দিয়ে আসবো, তাই আপনি আশা করেন নাকি?' জানলার দিকে সমরেশের এগিয়ে যাবার সময়টিতে বীথি তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে চোখ দিয়ে তাকে একটু অনুসরণ করলে। ঢিলে পাঞ্জাবির তলায় তার স্ফীত, দৃঢ় দুই কাঁধ ও তার উপরে মাথার সেই উদ্ধত স্পর্ধা ছাড়া কিছুই সে আর দেখতে পেলো না।

সমরেশের ফিরে আসবার সময়টুকুতে সে আবার বালিসে ভেঙে পড়লো। বললে, 'গায়ে যদি সেই সামর্থ্য থাকতো, তবে তো অনায়াসে দরজাটাই খিল দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারতুম। ডাক্তারি নিয়ে আপনার এই অন্যায় অত্যাচার আর সইতে হতো না। নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি বলেই না—'

মুখের কথাটা আলতো করে তুলে নিয়ে সমরেশ বললে, 'মাপ করবেন, এতো সুন্দর হয়ে উঠেছেন।' বীথিকে চোখে-মুখে একটু চটবার পর্যন্ত সে সময় দিলে না, 'দুর্বলতাটা এক এক সময় আমাদের চরিত্রের প্রকাণ্ড একটা শোভা হয়ে দেখা দেয়।'

বীথি যে কতো দুর্বল সেই মুহূর্তে যেন তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো। তার মেরুদণ্ডটা যেন আজ দুর্বলতায় নেতিয়ে পড়েছে।

'বেশ তো, ডাক্তার আনতে না দেন,' খাটের পাশে সমরেশ একটা চেয়ার এনে বসে পড়লো, 'আমাদের বাড়িতেই চলুন তবে।'

'কোথায় ?' বীথি যেন খাটের থেকে মাটির উপর খসে পড়লো।

'আমাদের বাড়িতে,' সমরেশ সহজ, নিখাদ, প্রসন্ন গলায় বললে।

'আপনাদের বাড়িতে ?' বীথির সমস্ত রক্ত মাথার মধ্যে এসে জমাট বাধলো বুঝি।

'হ্যাঁ,' সমরেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সেই তার স্পর্ধিত দৃপ্তিতে, বললে, 'হ্যাঁ, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনাকে আমি আমাদের বাড়িতেই নিয়ে যেতে এসেছি।'

দুর্বলতারও একটা সীমা আছে। আঁকাবাঁকা রেখায় টলতে-টলতে বীথি উঠে বসলো। তীক্ষ্ণ, তপ্ত গলায় বললে, 'আপনি কি বলতে চান ?' রাগটা যেন তাতেও প্রাঞ্জল হলো না, তাই আরেক পরদা চড়ায় তাকে উঠতে হলো, 'হোয়াট ডু ইউ মীন ?'

'সামান্যই।' সমরেশ উঠলো হেসে, 'বলতে চাচ্ছি, এই বিচ্ছিরি একা ঘরে জ্বরে আর গরমে কতো আর আপনি পচে মরবেন ? সেবা নেই, চিকিৎসা নেই, রুগী এমনি করে কতোদিন টিকতে পারে ? তার চেয়ে আমাদের ওখানে চলুন, বেশ ভালো হবে।'

বীথি শুকনো, খসখসে দুটি ঠোঁট ধারালো করে বললে, 'আপনি কি আমার অভিভাবক নাকি ?'

'কি আর করা যাবে ! আপনার অভিভাবকরা তো টুঁ শব্দটিও করছেন না।' সমরেশ তার অটল, উদ্দীপ্ত দৈর্ঘ্যে একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, 'অতএব, কি আর করা, আমাদের বাড়িতেই আপনাকে যেতে হবে। বাড়িটা আমার

নয়, আ-মা-দে-ব , সেখানে আমাব মা আছেন, বোনেবা আছেন, বলেন তো আমিই না-হয় সেখানে থাকবো না, বোগ নিয়েও আপনাকে আব সংকোচ কবতে হবে না কোনো। চলুন, মা আপনাকে নিযে যেতে বলেছেন সত্যি।'

'আপনাব দযাকে অনেক ধন্যবাদ।' বীথি দেযালে হেলান দিযে বসলো, কোলেব কাছে চোখ নামিযে বললে, 'কিন্তু দয়া বা সহানুভূতি যাই বলুন, আমি ওটাকে ভীষণ ঘৃণা কবি।'

'দয়া, সহানুভূতি, আপনি এ-সব কি বলছেন মাথামুণ্ডু?' স্বচ্ছ সবলতায় সমবেশেব দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'কাকে যে কি বলে তা দিযে আমাদেব কি হবে ?' সমবেশ আবাব অতি সহজেই যেন খাটেব দিকে অগ্রসব হলো, 'আপনি চলুন।'

বীথি দুই হাঁটুতে কুঁকড়ে গেলো, 'আপনি কি তবে আমাকে জোব কবে নিয়ে যেতে চান নাকি ?'

সমবেশেব মুখে সেই প্রশান্ত স্মিতহাস্য, 'যদি দয়া কবে অনুমতি দেন, তাও নিতে পাবি বৈকি অনায়াসে।'

বাগে ও দুঃখে বীথিব চোখে জল দাঁড়িযে গেলো, 'আপনি আমাকে বাড়ি বযে অপমান কবতে এসেছেন ?'

'অপমান ?' সমবেশ আবাব শব্দ কবে হেসে উঠলো, 'মাঝে-মাঝে অপমানিত বোধ কবতে পাবাটাও আমাদেব চবিত্রেব একটা মহিমা। জীবনে সম্মান তো আব এ পযন্ত কম পাননি, এখন একটু নিলেনই না-হয় অপমান। কি যায়-আসে।'

বীথিব শবীবেব শীর্ণতা তাব কণ্ঠস্ববে এসে টুকবো-টুকবো হযে পড়লো, 'চলে যান, আপনি চলে যান এখান থেকে।'

সমবেশ এতোটুকু কোথাও বিচলিত হলো না, শান্ত, স্নিগ্ধ মুখে বললে,

'গায়ে জোর নেই বলছিলেন, কিন্তু গলার জোর তো দেখছি একতিল কমেনি। চলে যান বললেই বা কি করে চলে যেতে পারি? শত-কণ্ঠে চেঁচিয়ে চলে যা বললেই তো জ্বরটা আপনার নেমে যাচ্ছে না।' সমরেশ অলক্ষ্যে বুঝি আরও এক পা এগিয়ে এলো। বললে, 'আপনি কিছু বুঝতে পাচ্ছেন না, আপনি চলুন আমাদের বাড়ি।'

দেয়ালটা ছিলো বলেই বীথি তার সঙ্গে মিশে যেতে পারলো। ছুরির মতো শীর্ণ, ধারালো গলায় বললে, 'আপনি আ-মা-র বাড়ি ছেড়ে দয়া করে চলে যান বলছি।'

'দয়া তো আপনি ঘৃণা করেন শুনলুম।'

'চলে যান, নইলে আমি এক্ষুনি চ্যাঁচাবো।' হাতের মুঠো দিয়ে গলার কাছেকার চাদরের অংশটা বীথি শক্ত করে চেপে ধরলো।

'চ্যাঁচাবেন?' সমরেশ ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো, 'কিন্তু আমার এই হাসির সঙ্গে আপনার চ্যাঁচানি কি পাল্লা দিয়ে জিততে পারবে?'

বীথির গায়ে এতোটুকু যেন আর জ্বর নেই, মাটির মতো মরা গলায় বললে, 'পাশের বাড়ির লোকদের আমি এক্ষুনি ডেকে আনবো তবে।'

'তাতে আপনার কি সুবিধে হবে?' সমরেশের সমস্ত মুখই সেই হাসির ঔজ্জ্বল্যে যেন কাঁপতে লাগলো, 'তার চেয়ে বলুন, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি, আমাদের বাড়িতে, আমার মা'র কাছে আপনাকে পৌঁছে দি। একা থাকাটা সব সময়েই বিশেষ নিরাপদ নয়, মিস সেন, শুধু চেঁচিয়েই তার সঙ্গে কোনো লড়া যায় না।'

'না, না, আপনি চলে যান, আমি আপনার কাছে মিনতি করছি,' বীথি দুর্বহ দুর্বলতায় বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো, 'আমি এই বেশ ভালো আছি, আমাকে এমনি থাকতে দিন দয়া করে।'

'অগত্যা।' সমরেশ দরজার দিকে নির্ভুল এগিয়ে গেলো। সেই শান্ত,

সমাহিত মুখে বললে, 'দয়া নয়, আমি যে চলে যাচ্ছি, তবু এটাকে আপনি দয়া মনে করবেন না। বেশ, মাকে আর বোনেদেরই না-হয় এখানে পাঠিয়ে দেবো।' দরজার কাছে এসে বীথির সঙ্গে সমরেশের সামান্য একবার চোখোচোখি হলো, 'আমাকেই না-হয় আপনার অবিশ্বাস, কিন্তু ওঁদের কাছে তো আপনার আর কোনো সংকোচ নেই। কি বলেন মিস সেন, ওঁরা তো আপনাকে আর অপমান করতে আসবেন না।'

সমরেশ বাইরে থেকে দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দিলে।

বীথি ভালো হয়ে উঠলো। কিন্তু ভালো হয়ে উঠতে-না-উঠতেই আবার তাকে এক্ষুনি ইস্কুল করতে হবে ভাবতে পৃথিবীতে কোথাও তার এককণা সুখ রইলো না।

শুধু তাই নয়, শরীরের যা হাল, তাকে ট্র্যামের রাস্তা পর্যন্ত নিয়মিত রিকসা করতে হচ্ছে দুবেলা। শরীরের মহাশয়তার জন্যে কাঁচা কতোগুলো পয়সা গুনগার দিতে হচ্ছে বলে তার শরীরটা চড়চড় করে উঠছে। ঐ পয়সায় তার ছোট ভাইটার জন্যে মাসে আধ-ডজন অন্তত কে-সি-বোসের বার্লি হতো।

সেই জন্যে বিকেলের খাবারটা সে শাদা একটা পাঁউরুটিতে শুকিয়ে এনেছে।

তেমনি একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে বীথি ছিড়ে-ছিঁড়ে একটা পাঁউরুটি চিবোচ্ছে, উড়ে-আসা খোলা একটা চিঠির মতো তার ঘরে একটি মেয়ে এসে হাজির।

রুটির টুকরোটা তার গলা দিয়ে নামাবার পর্যন্ত সময় হলো না, বীথি উথলে উঠলো, 'এ কি, নীলিমা যে! তুই কোত্থেকে? কি খবর?'

নীলিমা সেই প্রশ্নটার ধার দিয়েও গেলো না। আঁৎকে উঠে বললে, 'এ কি মাস্টারনি চেহারা করে বসে আছিস, বীথি? তোকে যে আর চেনাই যায় না।'

বীথি লজ্জিত হয়ে বললে, 'মাঝে একটা যে খুব বড়ো অসুখ থেকে ভুগে উঠলুম।'

তা তো শুনেছি, কিন্তু এ তো শুধু রোগে-ভোগা চেহারা নয়, এ যে কেমনতরো একটা ভূতে-পাওয়া চেহারা।' নীলিমা তার গায়ে একটা ঠেলা দিলো, 'আয়নায় একবার দেখেছিস নিজের মূর্তিটা ?'

বীথি পাংশু মুখে বললে, 'আমার স্বাস্থ্যের চেয়ে আমার মূর্তিটাই তোর কাছে বেশি হলো ?'

'তা ছাড়া আবার কি।' নীলিমা খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'বিয়ের আগে মেয়েদের স্বাস্থ্যের কথা উঠতেই পারে না। বিয়ের আগে দেখতে হয় শুধু রূপ, স্বাস্থ্যের কথা যদি নিতান্ত আসেই, তা একান্তই বিয়ের পরের পরিচ্ছেদে। বাঙলা-দেশে রূপ আর স্বাস্থ্য তো এক জিনিস নয়।'

'স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও বিয়েটাই মেয়েদের নিরিখ নাকি ?'

'নিশ্চয়,' হাসিতে নীলিমা সর্বাঙ্গে পিছল হয়ে উঠেছে, 'দেখিস না আমরা কেবল এতোদিন রূপেরই চর্চা করে এসেছি, স্বাস্থ্য কোথায়। পড়তে গেছি, জ্ঞানের জন্যে নয়, আমাদের ভালো দেখাবে বলে। কেউ-কেউ লাঠি ঘোরানো শিখছি, মাথায় কারো বাড়ি মারতে নয়, যাতে কিনা ভালো করে উনুনে বসে কাঠি ঠেলতে পারি।'

বীথি অবিশ্যি সে হাসিতে গলা মেলাতে পারলো না, বললে, 'তোকে আজকে হঠাৎ কথায় পেয়ে বসেছে দেখছি। কি খবর ?'

'প্রচণ্ড খবর।' নীলিমা হাতের অঞ্জলি দুটো উত্তেজনায় একত্র আঁট করে ধরলো, 'তোকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি, বীথি। আমার বিয়ে, আসচে বেস্পতিবার আমার বিয়ে হচ্ছে।'

'বিয়ে হচ্ছে ?' বীথি যেন আপাদমস্তক শীতের পাতার মতো শুকিয়ে গেলো, 'তুই না এম-এ পড়ছিলি ?'

'পড়তে গেছলুম, কিন্তু,' নীলিমা খোলা আকাশের পাখির পাখার মতো হালকা হয়ে গেছে, 'বাড়ির লোক হঠাৎ আবিষ্কার করলে, এম-এ পাশ

করে এলে মেয়ের তদুপযোগী পাত্র পাওয়া দুর্লভতরো হয়ে উঠবে। এমনিতেই দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যথেষ্ট। আর এম-এ নয়, এখন মে-য়ে হতে পারলেই বাঁচা যায়।'

'তাই বলে পড়া তুই ছেড়ে দিলি ?'

'কাঁহাতক আর পড়া যায় বাপু!' নীলিমা ঠোঁটের প্রান্তটা একটু কুঁচকোলো, 'পড়ে কি যে বা শিখলুম এতোদিন, তারা-ব্রহ্মময়ীই বলতে পারেন।'

'এই তো শিখলি।' বীথি বিদ্রূপেব একটা খোঁচা মারলো, 'বুড়ো বয়সে বিয়ের নামে স্ফূর্তিতে এমন উথলে উঠেছিস।'

'তোকে বলতে বাধা নেই, বীথি,' নীলিমা ভীরু চোখে ঘরের চারদিকে একবার দেখে নিলে, 'বয়েসটা বুড়ো বলেই এতো বেশি স্ফূর্তি হচ্ছে। পরীক্ষা পাশ-করারও একটা শেষ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সময়ের কোথাও সীমা দেখতে পাচ্ছিলুম না। সেই সময়েব চুলেব ঝুঁটিটা আজ, এতোদিনে, শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলতে পেরেছি।'

বীথি নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'কিন্তু পড়ার নিশ্চয়ই শেষ ছিলো না।'

'কেন চোখ ঠারছিস, বীথি ? আমাদের পড়া কোথায়, আমাদেব পাশ করা। ধর্, এম-এটাও না-হয় পাশ করলুম। তারপর ? সাধাবণতো তারপর তুই কি করতে পারিস ?'

'অনেক কববার আছে।'

নীলিমা কথাটা গায়েও মাখলো না। বললে, 'ছাই। এই তো শোভনা— ইকনমিক্সে এম-এ পড়ছে। পাশ করে ও কি করবে, ও কি করতে পারে সংসারে ? নিজে থেকে একটা বিয়ে পর্যন্ত করতে পারে না। এই তো তুই—এতো তো ফার্স্ট-টার্স্ট হলি, কিন্তু একটা মাস্টারি নেয়া ছাড়া আর কি করতে পারলি জীবনে ? সব মিলিয়ে তুই হলি কি ?

া, পরিবারের জন্যে অনেক করলি বটে, কিন্তু নিজের কি করলি জিগগেস করি ?'
'থাক, আমাকে নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না।' বীথি বিজ্ঞের মতো ..ান একটু হাসলো, 'তোর নিজের কথাই বল্।'
'তার আগে শোভনার কথাটা বলে নি।' নীলিমা বীথির মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো, 'সেদিন ও আমায় কি বললে, জানিস ?'
'কি বললে ? বললে বিয়ে করতে চাই ?'
নীলিমা হেসে ফেললো, 'মেয়েরা কোনোদিন তা মুখ ফুটে বলতে পারে না। বাপকে গিয়ে মুখ ফুটে যদি বলে, বাবা, রইলো তোমার এই খাতাপত্র, এবার আমাকে বিয়ে দাও দেখি, উঃ, সে হবে তবে তার একটা দুর্দান্ত চরিত্রহীনতা। অথচ শুনতে পাই বিয়েটাই নাকি মেয়েদের সামাম বোনাম। আর মেয়েরা তা বলতেই বা যাবে কেন, সেটা যে তাদের লজ্জা, সেটা যে তাদের অস্বাস্থ্য !'
'তোকে বক্তৃতা দিতে হবে না।' মাস্টারি গলায় বীথি তাকে একটা ধমক দিলো, 'শোভনা কি বলেছে তাই বল্।'
'সেদিন আমায় বললে,' শোভনার প্রতি সহানুভূতিতে মুখখানি নীলিমা করুণ করে আনলো, 'ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিকটা পাশ করলুম, সেটা বেশ বোঝা যায়, পড়তে এলুম কলেজে, সেটাও যা-হোক বুঝতে পারছি। পাশ করলুম আই-এ, তবু কোথাও সাড়া-শব্দ শুনছি না। আই-এ যখন পাশ করেছি, তখন বি-এটাও আর বাকি থাকে কেন ? কাটলো থার্ড-ইয়ার, কাটলো ফোর্থ-ইয়ার, প্রাণ-পণ মুখস্থ করে বি-এটাও পাশ করলুম, বাবা-কাকারা নামের পাশে বি-এ দিয়ে চিঠি লিখতে লাগলেন। তারপর, কি আর করি, মেয়ে হয়ে কি আর করা যায়, জমকালো ইকনমিক্স্ নিয়ে এম-এ পড়তে এলুম। তারপর আর কিছু

বোঝা যাচ্ছে না, নীলিমা, সিক্‌সথ্‌ ইয়ার ক্লাটতে চললো। এই যদি শেষ পর্যন্ত হবে জানতুম—সে আমাকে স্পষ্ট হাসি মুখে বললে—আমি বাড়িতে খাটের পায়া ধরে ঠায় বসে থাকতুম, নীলিমা, গান্ধির মতো হাঙ্গার-স্ট্রাইক করতুম, আমার বিয়ে দাও, আমাকে ছোট, তুচ্ছ, সাধারণ করে রাখো।'

বীথি রাগে রি-রি করতে লাগলো, 'সেই কথাটা এখন কেঁদে-ককিয়ে চারদিকে রাষ্ট্র করে দিয়ে এলেই হয়!'

'পাগল! পাশ-করা মেয়ে যে। পাশ-কবা মেয়ের যে অনেক অহঙ্কার! সে কি প্রাণ থাকতে অমন দুর্বলতা দেখাতে পারে? এতো পাশ করে তুই নিজে তা বুঝতে পাচ্ছিস না?' নীলিমা বীথির ছোট্ট বিছানাটি তার বিহ্বল, প্রসাবিত আলস্যে ভবে তুললো; বললে, 'আমার বেলায় তো ফ্যাসান করে মাঝে-মাঝে এসে মত চাওয়া হতো, বলতো: এটাতে তোর মত আছে? আমি ঘাড়ে একটা ঝিলিক দিয়ে বলতুম: কচু। যদি বলতুম: আছে, সেটা তবে একটা নিদারুণ নির্লজ্জতাব প্রমাণ দেয়া হতো, জানিস তো, লজ্জাই মেয়েদেব ঐশ্বর্য।'

বীথি আগের কথার জের টেনে বললে, 'বিয়ে যখন হচ্ছে না, তখন নিজে বেছে নিয়ে বিয়ে একটা করে ফেললেই হয়।'

'বেছে নিয়ে!' ছোট-ছোট হাসির ফুলে নীলিমা বিছানার উপব ছিটিয়ে পড়লো, 'কাকে বাছবে জিগগেস করি?'

বীথির মুখে কোনো কথা নেই।

'তুইই বল্, এতো তো তোর বয়েস হলো, এ পর্যন্ত বাইরের কটা ছেলের সঙ্গে তোর আলাপ হলো জীবনে? কাদের মধ্যে থেকে কাকে তুই বাছবি, বীথি? সে কে? সে কোথায়?'

'তবে এই যে শুনতে পাই,' বীথি শূন্য, নিষ্প্রাণ গলায়, প্রায় বোকার মতো

মুখ করে বললে, 'অমুক ছেলে আর অমুক মেয়ে লভ্ করে বিয়ে করলো ?'
'উপন্যাসে।' নীলিমা বালিশে দুই কনুইয়ের ভর রেখে ঘন হয়ে শুলো, 'সে-প্রেম হচ্ছে বিয়ে-না-হওয়ার একটা নিরুপায় সাবস্টিটিয়ুট, সে-প্রেমিক হচ্ছে নাই-মামার বদলে কানা-মামা। একজন ছেলে, জীবনে যে হয়তো আর কোনো মেয়ে পায়নি, আর একজন মেয়ে, যে হয়তো দেখেনি বাইরেকার কোনো ছেলের চেহারা—একদিন কি সূত্রে তাদের একটু আলাপ হলো, অমনি হয়ে গেলো অন্তরঙ্গতা, অমনি হয়ে গেলো সুগভীর প্রেম! উপায় কি, একজনকে না একজনকে ভাগ্যক্রমে চিনতে পারলেই হলো, নির্বাচন করবার সুযোগ কোথায় ? আগেকার কালে স্বয়ম্বর-সভায় অনেক-অনেক প্রার্থী এসে জড়ো হতো শুনেছি, তখন তুই চেয়ে-চিন্তে বুঝে-পড়ে একজনকে বাছতে পারতিস, এখন যাদের কথা তুই বলছিস, এদের বেলায়, নির্বাচনের সেই প্রশস্ত ক্ষেত্র নেই, প্রথম যে এলো সে-ই হয়ে উঠলো পরম। সারা জীবনে একটি কি দুটির সঙ্গে তো আলাপ, প্রেমের জন্যে কতোক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়! প্রেম বলে জিনিস যখন একটা আছে, আর বিয়ে যখন শিগগির হচ্ছে না, তখন, উপায় কি, হ্যাঁ, একেই তো প্রেমে পড়ে যাওয়া বলে।' নীলিমা খাড়া হয়ে উঠে বসলো, 'একে তুই প্রেম বলিস, বীথি ? এটা তো মনের অলস রচনা মাত্র, জীবনের আশ্চর্য ঘটনা নয়, এটা তো শুধু একটা উদ্ভাবন, নয় অন্বেষণের পর আবিষ্কার। তোর অন্বেষণের জায়গাই বা কোথায়, আবিষ্কারই বা কাকে ? ও-কথায় তাই তুই অমন গম্ভীর হয়ে বিশ্বাস করিসনে, বীথি। যেখানে বিচিত্রের থেকে বিশেষকে খুঁজে নেবার স্বাধীনতা নেই, সেটাকে তুই আর যা বল্ মানবো, প্যাঁচার মতো মুখ ভার করে প্রেম বলিসনে।'
বীথি শুকনো মুখে স্যাঁতসেঁতে একটি হাসি এনে জিগগেস করলে, 'তুই তবে কাকে বিয়ে করছিস ?'

'কাকে আবার! এক ভদ্রলোকের উপযুক্ত সুসন্তানকে।'

বীথি চমকে উঠলো, 'তাকে তুই চিনিস না? দেখিসনি কোনোদিন?'

'জীবনে মাত্র একদিন তাকে দেখেছি।'

'কবে?'

'যেদিন সে আমাকে দেখতে এসেছিলো।'

'তোকে সে দেখতে এসেছিলো, নীলিমা?'

কোথাও যেন এতে অবাক হবার কিছু নেই এমনি পরিচ্ছন্ন গলায় নীলিমা বললে, 'সাপ না ব্যাঙ, ছুঁচো না গঙ্গাভড়িং, না দেখে ভদ্রলোক ভদ্র-মহিলাকে বিয়ে করে কী করে? এর আগে স্বপ্নেও যখন আমরা কেউ কাউকে দেখিনি ত্রিভুবনে। তা ছাড়া গণ্ডার না হনুমান, রাক্ষস না খোক্কস, চোখ মেলে আমারও তো একবার দেখা দরকার।'

বীথি কাগজের মতো মুখ করে শাদা গলায় বললে, 'শেষকালে যাকে-তাকে একটা বিয়ে করবি?'

'কি আর করা যায় তা ছাড়া!' নীলিমা পরিতৃপ্ত মুখে পরিচ্ছন্ন হেসে উঠলো, 'তাকে যখন পাবার কোনো সুবিধে নেই, তখন যাকে-তাকে দিয়েই চালিয়ে নিতে হবে। আমাদের সমাজটা এক-এক দিকে খাপছাড়া ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, সংহত, সুবিস্তৃতভাবে বাড়ছে না। বাপ-মায়ের সুবিধের জন্যে আমাদের বয়েসটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ নিজের সুবিধার জন্যে বয়েসটাকে ব্যবহার করতে দেয়া হচ্ছে না। আমরা এম-এ পড়তে পারছি, অথচ একটাও প্রেমে পড়তে পারছি না। সত্যি কথা তোকে বলবো কি, বীথি,' নীলিমা এবার হাসিতে বর্ষিত হতে লাগলো, 'আমার দ্বারা ওটা কোনোকালে হতোও না। আমার ঘটে অতো বুদ্ধিও নেই, কবিত্বও নেই। তোদের ঐ প্রেম-ট্রেম আমার উপন্যাসে পড়তেই ভালো লাগে, যেমন ভূগোলে পড়েছিলুম গ্রীনল্যাণ্ডের কথা, এস্কিমোদের কথা।'

বীথি সংক্ষেপে জিগগেস করলে, 'তোর ভদ্রলোকটি কি করেন ?'
'কি আর করবে। বাঙালী ভদ্রলোকের যদ্দূর দৌড়। চাকরি।'
'কোথায় ?'
'এইখানেই, কলকাতায়। কি জানি একটা আপিসে। অতো খোঁজে দরকার নেই, শুধু শুনেছি শ' দেড়েক টাকা নাকি মাইনে। আর যাই হোক, ইচ্ছে মতো বায়স্কোপ দেখতে পাববো, বীথি।'
'বায়স্কোপ দেখতে পাববি ?'
'হ্যাঁ,' নীলিমা হাসতে হাসতে দুই হাতে মুখ ঢাকলো, 'আর আমার খারাপ হবার ভয় নেই যে। তোকে বলবো কি, বীথি, বাবা একবার অনেক বাছ বিচার করে আমাকে জ্যাকি কুগানের একটা ছবি দেখাতে নিয়ে গেছলেন। তারপর জ্যাকি কুগান বড়ো হয়ে বায়স্কোপ করা ছেড়ে দিলো, আমিও বড়ো হয়ে বায়স্কোপ দেখা ছেড়ে দিলুম।'
পাছে দীর্ঘশ্বাসটা শোনা যায় সেই ভয়ে দ্রুত একটি হাসি দিয়ে বীথি সেটাকে পিষে ফেললে, 'বিয়ে কবে হচ্ছে ?'
'বললুম যে, এই আসচে বেস্পতিবার।' নীলিমা উঠে বসে খোঁপাটা ঠিক করতে লাগলো, 'আরো আগেই হতো, কিন্তু মাঝখানে একটা খটকা বেধেছিলো।'
বীথি সামান্য কৌতূহলী হয়ে বললে, 'কি ?'
'সেই সুসন্তানের পিতৃদেব বরযাত্রীদের যাতায়াত-খরচা বাবদ বাবার কাছে হাজারখানেক টাকা দাবি করেছিলেন।'
'তার কি হলো ?'
'কি আর হবে ?' নীলিমা আঁচলটা কাঁধের উপর দিয়ে লতিয়ে দিয়ে ভাঁজগুলিতে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'অনেক দর-কষাকষি করে সাড়ে সাত শো টাকায় রফা হয়েছে।'

'তা হলে তাঁরা পণ নিচ্ছেন বল্।' বীথি মুখিয়ে উঠলো।
'হ্যাঁ, তাকে একরকম পণ নেয়াই তো বলে। সোজাসুজি চাইলেই বা কি করা যেতো?'
'কি করা যেতো! শেষকালে পণ দিয়ে তুই বিয়ে বসবি?'
'পণ আমি দিচ্ছি কোথায়, পণ বাবাকে দিতে হচ্ছে। না দিয়েই বা তিনি কি করতে পারেন?' নীলিমা ঝলমলিয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'আমাকে যখন প্রেম করতে দিলেন না, তখন বাধ্য হয়ে পণ তো তাঁকে দিতেই হবে।'
'তবু তুই একবার আপত্তি করলি না?'
'আপত্তি করলে লাভের মধ্যে থেকে বিয়েটাই হাত থেকে ফসকে যায়!' নীলিমা আবার একটা হাসির ঢেউ তুললে, 'কিছু ভাবনা নেই, বীথি, এমন অনেক সাড়ে-সাতশো টাকা শোষা যাবে।'
'ছি-ছি, আমি তা ভাবতেও পারছি না।' বীথিও উঠে দাঁড়ালো, 'শেষকালে পণ দিয়ে বিয়ে!'
'আজকাল,' নীলিমা সুর করে বলে উঠলো, 'যে-দিকে ফিরাই আঁখি, পাশ-করা মেয়ে দেখি। রামীও পাশ, শ্যামীও পাশ—কাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে করা যায়? আগে-আগে পাশ দিয়ে পণ এড়ানো যেতো, এখন পাশে-পাশে ধূল-পরিমাণ! তাই আবার এসে যাচ্ছে সেই চেহারার কথা, রঙ উত্তম-শ্যাম না ফ্যাকাসে-ফর্সা, এই নিয়ে মারামারি। কিন্তু কোথাও প্রেমের,' নীলিমা হেসে উঠলো, 'তোর সেই বহু-আখ্যাত প্রেমের দেখা নেই। নইলে বল্, আমি আর সেই ভদ্রলোকের সুসন্তানটি যদি পরস্পরের প্রেমে পড়তে পারতুম, তা হলে কোনো পক্ষ থেকে কেউ কোনো একটা টাকার কথা তুলতে পারতো? পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে, যেখানে বিয়েটা তাদের হয় না, বিয়েটা তারা

করে—এমনি একটা ব্যবসাদারি কথা ওঠে? তবু তো শুনি বিয়েটা ওদের ধর্ম নয়, বিয়েটা ওদের চুক্তি। নেয়াই তো উচিত, এই সব বাপের থেকে—বিশেষ করে পাশ-করা মেয়ের বাপের থেকে পণ নেয়াই তো উচিত একশো বার। আমি ছেলে হলে, তেমন একটা উপযুক্ত ছেলে হলে, মেয়ের বাপকে শুষে একেবারে শেষ করে দিতুম, বলতুম: আগে থাকতে তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়তে দাওনি কেন, এখন, হে নরাধম, তার প্রায়শ্চিত্ত করো।' নীলিমা একটা নাটকীয় ভঙ্গি করলে।

বীথি রইলো উদাসীনের মতো তাকিয়ে।

নীলিমা যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ফিরলো। বললে, 'তুইও এক কাজ কর্, বীথি। তোর বাবা না পারেন, তুই তা নিজেই পারবি স্বচ্ছন্দে। কিছু-কিছু করে মাস-মাস জমাতে থাক, এমনিতে না হয়, সেই জমানো টাকায় পণ দিয়ে চোখ বুজে একটা বিয়ে করে ফ্যাল।'

'সবাইকে তোর মতো পাসনি।' বীথি নির্মম, দৃঢ় গলায় বললে, 'বিয়ে আমি করবোই না।'

নীলিমা হঠাৎ জিভ কাটলে, 'ও-কথা বলিসনে, বীথি,' আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে তার একখানি ভিজা, ঠাণ্ডা হাত সে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো, 'ও-কথা বলতে নেই। ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে দেবতারা কান পেতে আছেন।'

'থাকুন।' বীথি কি-রকম করে যেন হাসলো, 'তোর দেবতারা শুনতে পেলেও আমার দেবতারা বধির।'

'আমার দেবতা প্রজাপতি, আর তোর দেবতা প্যাঁচা।' নীলিমা তার হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলো, 'আমার দেবতাকে যাস কিন্তু দেখতে।'

উদাস গলায় বীথি প্রশ্ন করলে, 'কবে?'

'ভয় নেই, এই জন্মেই। এই আসচে বেস্পতিবার।' হাতটা আস্তে-আস্তে নামিয়ে নিয়ে নীলিমা দরজার কাছে সরে গেলো, 'যাস কিন্তু ঠিক।'
'দেখি।'
'আর দেখি-ঠেকি নয়, যেতেই হবে। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।' নীলিমা খুকির মতো আবদারে চোখের দৃষ্টিটা একটু বাঁকা করলে, 'তোরা গিয়ে আমায় সাজিয়ে দিবিনে?'
বীথি নিচে তাকে হয়তো একটু দাঁড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলো, নীলিমা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, তোকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। ঐ দাদা হর্ন দিচ্ছে মোটরে, সেই দুপুর থেকে দুজনে নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি, কতো জায়গা এখনো বাকি আছে। চললুম, যাস কিন্তু ঠিক।'
বীথি শূন্য একটা ছায়ার মতো ঘরের মধ্যে অনাবশ্যক দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কি করা যায়, অভ্যাসবশত চুল খুলে চিরুনি দিয়ে জট ছাড়াতে লাগলো, কিন্তু সিঁথিটা ঠিক করতে এবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে মনে করে তার আর পা উঠলো না।

সেই বাত্রে বীথি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলে।

যেন কোথায় প্রকাণ্ড একটা বাড়িতে সে বেড়াতে গেছে—ভীষণ ভিড়, আব বলা বাহুল্য, কেবল মেযেদেবই ভিড, মেযেদেব ভিড় ছাড়া অন্য কোথাও সে স্বপ্নেও যেতে পাবে না—হাসিতে-পোশাকে, গল্পে-গোলমালে প্রত্যেকে এক একটি ফেনিল উত্তালতা। ঘবেব মধ্যে, দূবে শ্বেত-পাথবেব একটা বেদীতে পাষাণকায এক দেবীমূর্তি—আপনাব সুমহান মৌনে স্থির হয়ে দাঁড়িযে, দুই হাতে তাঁব বলীযান ববাভয়। এক একটি করে মেয়ে সেই বেদীমূলে, দেবীমূর্তিব পায়েব কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে, আর সেই নিষ্ঠব, স্তূপীকৃত পাথবে আস্তে-আস্তে জাগছে ভাষাব অস্ফুট একটি চাঞ্চল্য, হাসিব স্তিমিত একটি আভা। কি যেন তিনি তাদেব একে-একে জিগগেস কবছেন, আব তাদেব উত্তব শুনে স্নিগ্ধ স্মিতহাস্যে কবছেন আশীর্বাদ।

ব্যাপাবটা কি জানবাব জন্যে বীথি কান খাডা কবে বইলো।

একটি মেয়ে, তাকে বীথি চেনে না, ডাক পড়তেই ধীবে-ধীরে বেদীব কাছে এলো সবে। দেবীমূর্তি তাকে জিগগেস কবলেন, 'তুমি কেন বিয়ে কবতে চাও?'

মেয়েটি গালেব আধখানায় লজ্জাব ঢেউ তুলে বললে, 'তার আমি কি জানি! বাবা-মা বলছেন বিয়েটা হোক, বিয়েটা তাই হচ্ছে।'

দেবী তাকে আশীর্বাদ কবলেন।

আবেকটি মেয়ে এলো।

'তুমি কেন বিয়ে কবতে চাও?'

মেয়েটি ভুরু দুটি একটু তেরছা করে বললে, 'তামাশা দেখতে। ছেলেবেলা থেকেই আমি খুব কৌতূহলী।'

'আর তুমি ?'

'ভালো-ভালো শাড়ি পরতে, মোটর চড়তে, দেশ বেড়াতে। ছেলেবেলা থেকেই আমি বড়ো দুঃখী।'

'আর তুমি ?'

'দিন-দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না ? এখন বিয়ে না হলে আর হবে নাকি কখনো ?'

'আর তুমি ?' দেবী পঞ্চমসংখ্যকাকে জিগগেস করলেন।

'যাতে আর আমার খারাপ হবার ভয় না থাকে, যাতে শত গ্রীষ্ম হলেও হাড়ে আমার বাতাস লাগতে পাবে, যাতে শরীরটাকে সব সময় একটা শাস্তি মনে না হয়।'

এবার যে এসে দাঁড়ালো, বীথি ভালো করে চেয়ে দেখলো, নীলিমা।

দেবীমূর্তি তার দিকে আঙুল তুললেন, 'তুমি, তুমি কেন বিয়ে করতে চাও ?'

নীলিমা অকুণ্ঠ গলায় বললে, 'যাতে ইচ্ছেমতো বায়স্কোপ দেখতে পারি, থিয়েটারে যেতে পারি, উপন্যাস পড়তে পারি খুশিমতো।'

দেবী যে এ-সব উত্তরে বিশেষ প্রসন্ন হচ্ছেন না, পরের মেয়েটি তা যেন জলের মতো বুঝতে পারলো। তার ডাক পড়তেই সে গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি বিয়ে করছি ধর্মের জন্যে। বিয়ে করাটা চমৎকার পুণ্য কাজ।'

'আমার বাপু স্পষ্ট কথা।' পরের মেয়েটি কিছু মুখরা, হাত ঘুরিয়ে বললে, 'আমি বিয়ে করছি ছেলেপিলের জন্যে। নইলে বুড়ো হলে আমাকে খাওয়াবে কে ?'

'আর তুমি ?' দেবীমূর্তি আবার কাকে ইশারা করলেন।

এবার দেখা গেলো শোভনা এগিয়ে আসছে। বইয়ের পৃষ্ঠার মতো শুকনো।

'আমি ?' পাছে আশে-পাশের কেউ শুনতে পায় শোভনা ফিসফিসিয়ে বললে, 'আমি ইকনমিক্স্ আর পড়তে পারি না।'

এমনি আবো অনেক মেয়ে আরো অনেক সব জবাব দিয়ে গেলো, বীথি সব কথা ভালো কবে শুনতেও পেলো না। কেউ বললে : স্বামী হচ্ছে পুরুষবেশে দেবতা, যেমন বাবণেব কাছে বাম ছিলো শত্রুবেশে নারায়ণ, আমি দেবতাব সেই পাদপদ্ম আরাধনা করে বৈকুণ্ঠে যাবো। কেউ আবাব বললে : স্বামী হচ্ছে আমাদেব বাহন, শীতলাব যেমন গাধা, তাব ঘাড়ে চড়ে আমি আমাব জীবিকাব সমস্যাটা সহজ কবে ফেলবো। জীব দিয়েছেন যিনি, আহাব দেবেন তিনি।

ভিড় প্রায হালকা হয়ে এসেছে, মেয়েবা যে যার চলে যাচ্ছে বাড়ি, দেবীমূর্তি তবু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে।

'তুমি ? তুমি তো কিছু বললে না ? তুমি কেন বিয়ে কবতে চাও ?'

বোগা, শীর্ণ একটি মেয়ে ভীরু চোখে চাবদিকে তাকাতে তাকাতে বেদীর কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো।

'বলো,' দেবীমূর্তি তাকে অভয় দিলেন, 'আমাকে বলতে তোমার লজ্জা কি ?'

মেয়েটি তাব ব্যথিত মুখ দেবীব মুখের দিকে তুলে ধবলো।

এ কি, ঘুমেব মধ্য থেকে বীথি উঠলো চমকে। এ যে সে, এ যে সে নিজে। কি আশ্চর্য, সে এখানে এলো কি কবে ? তাব এখানে কি কাজ ? সে তো এদেব মতো কোনোদিন বিয়ে কবতে চায়নি। সে চিবকাল একা থাকবাব স্বপ্ন দেখেছে, অসামান্য থাকবার ! এখানকার রাস্তা তাকে কে চেনালো ? এ কি নির্লজ্জতা !

দেবীমূর্তি স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্বরে বললেন, 'ঘরে এখন আর কেউ নেই, শুধু তুমি আর আমি। তুমি আর তোমার আত্মা। চুপিচুপি আমাকে বলো— আমাকে না বললে আর কাকে বলবে?'

মেয়েটি ভীত, বিবর্ণ গলায় বললে, 'আমি বড়ো একা।'

'সেই জন্যে তুমি বিয়ে করতে চাও?' দেবী যেন বেদনায় একটু হাসলেন, 'তোমারও জীবনে এর বেশি আর কোনো বড়ো ব্যাখ্যা নেই, বীথি?'

বীথি তার ঘুমের অন্ধকারে জীবনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বৃহত্তর একটা ব্যাখ্যা খুঁজতে লাগলো। আর তার ঘুম গেলো ভেঙে। জানলা দিয়ে ভোরের সূর্য রাশি-রাশি সোনার লজ্জার মতো তার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

কিন্তু বীথি নিজেকে আর কি করে একা বলতে পারে ?

সমরেশের বোনেরা হরদম তার বাড়ি আসে, সমরেশের বিধবা মা স্বর্ণময়ীর ডাকে হামেসাই তাকে ও-বাড়ি বেড়াতে যেতে হয়। এখন থেকে তিনি তো মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন, ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় বিকেলের জলখাবারটা তাকে ওখানেই খেয়ে নিতে হবে। সেদিন সন্ধ্যের সময় তুমুল বৃষ্টি এসে গেলো দেখে তিনি তো তাকে যেতেই দিলেন না, খাইয়ে-দাইয়ে নিজের পাশটিতে শুইয়ে রাখলেন।

বীথি একবার ক্ষীণ একটি প্রতিবাদ করতে গেছলো, 'ঝিটা ভাববে, মা।'

স্বর্ণময়ী কৃত্রিম শাসনের সুরে বলেছিলেন, 'তুমি কি এখন তোমার ঝি-র অভিভাবকত্বে আছো নাকি ? ভয় নেই, আমাদের বাড়ির ঝিকে পাঠিয়ে তাকে ভাবতে বারণ করে দিয়েছি। মা'র চেয়ে ঝি-র ভাবনাই বুঝি বেশি হলো।'

বীথি বিমর্ষ হয়ে গেলো, 'আশে-পাশের ঘরে অনেক সব চেনাশুনো লোক আছে মা, তাদের কিছু বলে আসিনি।'

'তাদের আবার কি বলবে ? তোমার যে এতো বড়ো একটা অসুখ গেলো, তারা এসেছিলো কিছু বলতে ?'

না, একে আর একা বলা চলে না। মা'র পাশে শুয়ে সমস্ত বাড়িতে সে কার একজনের অনুপস্থিতির তাপ অনুভব করে।

তার জন্যে তোমার আজকাল দস্তুরমতো প্রতীক্ষা করতে হয়। সে এসে পড়লে তুমি আজকাল আর চমকে ওঠো না, শিউরে ওঠো। এক

পা-র পর আরেক পা ফেলে অগ্রসর হলে তোমার গা ভরে সেই অমানুষিক ভয় করে না আর। বরং, লজ্জা কি বলতে, ফের জ্বর হলে বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে থাকতেই বুঝি তোমার ভালো লাগতো।

কথা যদি কখনো না-ই কইবার থাকে, চুপ-করে-থাকাটিও তোমার মন্দ লাগে না। কোনটা যে কথা, আর কোনটা যে কথা নয়, তাই বা তোমাকে কে বলে দেবে?

ইচ্ছা করলে তুমি চেয়ারে আর সমরেশ তোমার খাটের উপরই বসে পড়তে পারে। রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে হিন্দুস্থানীদের একটা বিয়ের মিছিল চলে গেলে তুমি আর সে একই জানালায় এসে দাঁড়াতে পারো। একই জানালায় দুজনের জন্যে এখন অনেক জায়গা।

জায়গা ও সময় কেমন সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে তারই একটা ঘটনা বলি।

ইস্কুল থেকে এসে বীথি একটা চেয়ারে টুকরো-টুকরো হয়ে বসেছিলো, এলো সমরেশ—তার সেই বলিষ্ঠ দৈর্ঘ্য, সেই সমুদ্ধত দীপ্তিতে। বললে, 'এ কি, কি হলো আপনার?'

'ভীষণ ক্লান্ত,' বীথি সন্ত্রস্ত হবারও এতোটুকু চেষ্টা করলো না, 'জামা-কাপড়গুলি বদলাতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুমুতে হলে বিছানাটা পাততে হয়, সেই ভেবে আর উৎসাহ নেই।'

সমরেশ আরেকটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসে পড়লো। আর কোনো কথা নেই, বলে বসলো, 'মাস্টারি আপনি ছেড়ে দিন।'

কথাটা যেন গায়ে মাখবার নয় এমনি ঔদাসীন্যে বীথি বললে, 'মাস্টারি ছেড়ে দিলে খাবো কি?'

'তা জানি না,' সমরেশ প্রসন্ন গলায় বললে, 'কিন্তু নিজের মাথাটা খাওয়া ছাড়া মানুষের আরো অনেক খাদ্য আছে।'

'পাগল ! মাস্টারি আমার মজ্জায়-মজ্জায় বসে গেছে।'

'বেশ তো, মাস্টারিই না-হয় করবেন, কিন্তু সাড়ে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত একটানা ইস্কুলে নয়, প্রাইভেট টিউশান—ধরুন, কালকে থেকে যদ্দিন না ছাত্র মারা যায়।'

'ছাত্র ?'

'হ্যাঁ, ছাত্ররাই তো বেশি মাইনে দিতে পারবে।' সমরেশ হেসে উঠলো, 'ইস্কুলে যা পান তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা, অনেক বেশি সম্মান। আর এ-ছাত্রটি, আমি যদ্দূর জানি, বেশ বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানকে পড়িয়েই তো সুখ।'

'এমন ছাত্র আপনি কোথায় পাবেন ?' বীথি তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো।

'সেই বুদ্ধিমান তো আপনার কাছেই বসে আছে।'

'আপনি ?' বীথি পায়ের নখমূল পর্যন্ত শিউরে উঠলো, 'আপনাকে আমি পড়াবো কি !'

সমরেশের মুখে এতোটুকু উদ্বেগ নেই, 'এই—কি করে রাঁধতে-বাড়তে হয়, ঘর দোর গুছিয়ে দিতে হয়—এই সব ছোট-খাটো একসারসাইজ।'

বীথি যেন আরো ভেঙে পড়লো, এমন কি, তার কণ্ঠস্বরে। বললে, 'কাপড় যে তৈরি করে তাকে আপনি বলতে পারেন না কি করে কাপড় কাচতে হয় আমাকে শিখিয়ে দাও। যে মজুর গাঁইতি দিয়ে রাস্তা খোঁড়ে, তার কাছে দাবি করতে পারেন না, এ রাস্তায় সে আপনার মোটর চালাবার কৌশল বাৎলে দেবে। সুনীতি যে প্রচার করে, আপনি আশা করতে পারেন না সে নিজে হবে সচ্চরিত্র।'

তারপর আর তাদের কোনো কথা নেই।

কথা কি মানুষের অনেকগুলির মধ্যে আরেকটা ব্যর্থ আবিষ্কার নয় যা

তার অতীত সেই ইশারাকে শুধু কথা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে সেই অকথনীয়তা ফেলে হারিয়ে ?

কে জানে, কিন্তু সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বীথি দেহ-মনের গূঢ়তম অন্ধকারে তলিয়ে হাতড়ে ফিরতে লাগল—এটা কি ? এরই নাম কি ভালোবাসা ? এই নিয়েই কি শেলি তার প্রমীথিউস আনবাউণ্ড লিখেছিলো ? এই যদি ভালোবাসা হয়, তবে তার শরীরে সেই মহান উদ্দীপনা নেই কেন, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সেই অতীন্দ্রিয় প্যাশান, তার মনে নেই কেন সেই রহস্যের ইন্দ্রজাল, সমস্ত শরীরে সেই অশরীরী হয়ে যাওয়া ! এ যেন একটা ক্লান্তি, এ যেন একটা আলস্য, এ যেন একটা সমর্পণ।

নরম মোমের আলো জেলে যখন সে সামান্য কথা দিয়ে প্রেমের কবিতা লিখতো তখন সে এর ও চেয়ে মহত্তর উত্তেজনা অনুভব করেছে।

দেবীমূর্তি আবার স্বপ্নে এসে দেখা দিলেন।

ঘুমের মধ্যে বীথি অস্ফুট স্বরে কেঁদে উঠলো। যেন বললে, 'দাঁড়াও, আরো ক'টা দিন অপেক্ষা করো। তোমার প্রশ্নের এবার আমি একটা খুব ভালো উত্তর তৈরি করছি।'

স্বর্ণময়ীর মুখেও সেই কথা, 'খেটে-খেটে এ কি হাড়গিলের মতো চেহারা করছ, বীথি ? মাস্টারিটা তুমি ছেড়ে দাও।'

বীথি ম্লান হেসে বললে, 'তার বদলে কি করবো, মা ?'

'কি আবার করবে!' স্বর্ণময়ী তাকে দুই হাতে হঠাৎ কাছে টেনে নিলেন, 'নিরিমিষ্যি ঘরে গিয়ে আমার জন্যে একবেলা রাঁধবে, আমার পূজোর ঘরটা একটু গুছিয়ে দেবে, অঘোরে ঘুমুবে হাত-পা ছড়িয়ে।'

'তোমার জন্যে বাঁধতে তো আমি এখনো পারি, মা।'

'কিন্তু এখন খারাপ বাঁধলেও যে তোমাকে প্রশংসা করতে হয়, বীথি।

তখন তরকারিতে একটু নুন বেশি হলে,' স্বর্ণময়ী তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, 'তখন তোমাকে ছেড়ে কথা কইবো ভেবেছ নাকি ?' তাঁর স্পর্শে বীথির মেরুদণ্ডটা সিরসির করে উঠলো।

আরো কদিন যেতে, স্বর্ণময়ী এবার তার কপালে একটি চুমু খেলেন, বললেন, 'তোমার মাকে চিঠি লিখে দিলুম, মা।'

'মাকে ?' বীথি পায়ের নিচে যেন একটা সাপ দেখলো, 'মাকে আবার কি লিখতে গেলেন ?'

'লিখলুম, আমার ছেলে তাঁদের এমন কিছু অযোগ্য জামাই হবে না। দিল্লিতে তার এবার দুশো টাকার চাকরি হয়েছে। আরো লিখলুম—'
বীথি তাঁর মুখের দিকে বোকার মতো চেয়ে রইলো।

'আরো লিখলুম, আমার মা,' স্বর্ণময়ী নির্বিঘ্নে বীথিকে অ[illegible] লাগলেন, 'তুমি তো কেবল তাঁরই মেয়ে নও, আমারও মেয়ে[illegible] মা'র আমার এতে আপত্তি নেই একটুও। বরং, মতই আছে[illegible] কি বলো ?'

বীথি ঘরের শূন্যতার মতো চুপ করে রইলো।

'আরেকটা কথা কিছুতেই লিখতে পারলুম না।' স্বর্ণময়ী তাঁর দীপ্যমান শুচিতায় হেসে উঠলেন, 'ছেলের মা হয়ে তা কি করেই বা লেখা যায় ? শত হলেও তো সমাজে ছেলের মা'র একটা মর্যাদা আছে! ছেলের মা হয়ে কি করে লিখতে পারি বলো, আমার ছেলে এই মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে ঠিক করেছে।'

বীথি হঠাৎ ছুরির ফলার মতো কেটে বেরিয়ে এলো, বললে, 'কিন্তু মাকে, মাকে লিখতে গেলেন কেন ?'

স্বর্ণময়ী উদারতায় উদ্ভাসিত হয়ে বললেন, 'তোমার মাকে লিখতে যাওয়াই কি ঠিক নয় ? তাঁরা যখন বর্তমান আছেন, আর বলতে গেলে,

তাঁরাই যখন তোমার বিয়ের কর্তা। আমি লিখে দিয়েছি, বেশি দেরি করে কোনো লাভ নেই, অঘ্রানে, ওর কাজে গিয়ে জয়েন করবার আগেই, ব্যাপারটা যাতে চুকে যায়। কোনো তাঁদের হাঙ্গামা নেই, কষ্ট করে একবারটি শুধু কলকাতায় আসা—তোমার বিয়ের সব কাণ্ড-কারখানা আমিই যোগাড় করে দেবো। বলতে গেলে আমারই তো গরজ—মা হয়ে সন্তানের মুখের দিকে না তাকিয়ে তো আমি পারি না।'

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে বীথি অনেকক্ষণ কাঁদলে। মাকে—মাকে লিখতে যাওয়া হলো কেন? তার বিয়েতে তাঁদের কি কৌতূহল, তাঁদের কি কর্তব্য, তাঁদের কি মতামতের দাম! তারই যখন বিয়ে, তখন, একান্ত করে তারই মতের জন্যে আরো ক'টা দিন কেন অপেক্ষা করা হলো না? সে যে বহুদিন ধরে গোপনে-গোপনে 'খুব একটা ভালো উত্তর' তৈরি করছিলো। তাব সেই অকুণ্ঠ উচ্চারণের আগে পৃথিবীতে আর কোনো ভাষা আছে নাকি, আর কোনো জিজ্ঞাসা আছে নাকি?

সমরেশের জন্যে দবজা দুটো খোলাই আছে সেই থেকে।

'তুমি একদিন বলছিলে না বাঙলা-দেশেব বাইরে কোনো কাজের খবব পেলে তোমাকে জানাতে।' সমবেশ ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললে, 'তেমনি একটা খবর পাওয়া গেছে। শুধু খবব নয়—একেবারে একটা চাকবি।'

বীথি মবা গলায় বললে, 'জানি।'

'কোথায় বলো তো?'

'দিল্লিতে।'

সমরেশ উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'কতো মাইনে বলো তো?'

'দুশো টাকা।'

'কবে জয়েন করতে হবে জানো?'

বীথি কাঁধের থেকে মুখ তুললো, 'না।'

'যতো শিগগির হয়, যতো শিগগির।' সমরেশ তার চেয়ারের কাছে সরে এলো, বললে, 'যাবে, তুমি যাবে ?'

বীথি দুই হাতে মুখ ঢাকলো, বললে, 'জানি না।'

স্বপ্নের জগৎ থেকে দেবীমূর্তি একটু হাসলেন।

না, না, একে তুমি প্রেম বলতে পারো না, এ শুধু একটা দুর্বল প্রতিধ্বনি, একে তুমি অধিকার বলতে পারো না, এ শুধু একটা অসহায় সমর্পণ, একে তুমি উল্লাস বলতে পারো না, এ শুধু একটু শীতল নিস্তরঙ্গতা।

দেবীমূর্তি স্বপ্নে আবার দেখা দিলেন। বললেন, 'কেন বিয়ে করতে চাও, বীথি ?'

'ক্ষমা করো,' বীথি ঘুমের মধ্যে মা-হারা শিশুর মতো কেঁদে উঠলো, 'আমার সময় নেই, আমি সেই ভালো উত্তর আজও তৈরি করতে পারিনি। আমি একা—সেই একা—মরবার আগেকার মুহূর্তের মানুষের মতো একা।'

বলা বাহুল্য সর্বাণী দেবী স্বর্ণময়ীর সেই চিঠির জবাব দেননি।
চিঠির জবাব দিলেন বিনায়কবাবু, আর তা বীথির কাছে।
চিঠির ওজন আর ঠিকানার হরফ কটি দেখেই বীথি কেমন অনায়াসে বুঝতে পারলে, গঙ্গায় আর একবিন্দু জল বইছে না।
আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়বার তার স্নায়ু নেই। গোড়ার কয়েকটা লাইনেই [illegible]পসা দেখতে লাগলো। সব গেল তালগোল পাকিয়ে।
[illegible]ছেন :
[illegible]মার মা কলকাতা থেকে এক উড়ো চিঠি পেয়েছেন তুমি [illegible] সমরেশ ঘোষকে বিয়ে কববার জন্যে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য [illegible]টাকে উড়ো-ই বা কি করে বলি—যে-মহিলাব নামে চিঠি দেয়া হয়েছে, নাম-ধাম, জ্ঞাতি-গুষ্টি দেখে তাকে আমাদের চেনা-ই মনে হলো দস্তুরমতো। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়, যে রকম খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তা সত্যি মনে না হবার কোনো কাবণ নেই, তবে ভাবো, তোমাব এ কি কাণ্ড বীথি, এ কি তোমার কলুষিত অধঃপতন!
বীথি তারপব সবটা আর এক নিশ্বাসে পড়তে পাবলো না। জায়গায়-জায়গায় লাইনগুলি খোঁচা-খোঁচা কাঁটার মতো তাব মর্মমূলে লাগলো বিঁধতে :
তোমার মামাবাবুকে চিঠি লিখে দিলুম, এ-সব কেলেঙ্কারিব যেন তিনি না প্রশ্রয় দেন।
তারি জন্যেই বুঝি তাঁর সঙ্গে আজকাল আব সম্পর্ক রাখছ না? তারি

জন্যেই বুঝি সুবিধে বুঝে আলাদা বাড়ি ভাড়া করেছিলে ? তুমি যে এতোদূর নেমে যেতে পারো এ আমি বিশ্বাস করি না।

তোমার চোখের সামনে উপবাসী এক সংসার, ক্ষয়-ক্ষীণ অপোগণ্ড কটি ভাই-বোন, অক্ষম, অপদার্থ বাপ-মা, তুমি কি বিশাল দায়িত্ব নিয়েছ দুই হাতে, তোমার এ কি অকর্মণ্য চিত্তবিভ্রম, এ কি তোমার নৈতিক অবনতি !

যে যা-ই বলুক, আমি তোমাকে চিনি, আমি কখনোই বিশ্বাস করবো না, তুমি তোমার সেই মহান চরিত্র থেকে এক তিল ভ্রষ্ট হতে পারো, জীবনের মহত্তর কর্তব্যের চেয়ে বেশি মূল্য দিতে পারো খেলো এই একটা দৈহিক বিলাসিতাকে।

তুমি আমার মেয়ে, মিছিমিছি তবে তোমাকে আমরা কেন এতে লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম, এতো বড়ো করেছিলুম, যদি তার সম্মানই না রাখতে পারবে, তবে কেন দিয়েছিলুম এই স্বাধীনতা ?

সেই দিনও তো তুমি বিয়ে করবে না বলে মত দিয়েছিলে।

একবার আমাদের কথাটাও ভেবো—যারা দিন নেই, রাত নেই, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি। তুমি বড়ো হয়ে মাথা খাড়া করে উঠেছ—পরাজিত পৃথিবীতে এই যাদের একমাত্র অহঙ্কার।

সত্যি, তোমার বয়েস তো আর কম হয়নি, এখন তো তুমি নিজেই সব বুঝতে পারো।

এই তোমার পিতৃভক্তি ? এই তোমার ভ্রাতৃস্নেহ ? এই তোমার পরিবারের প্রতি কর্তব্য ? এই তোমার বংশের মুখোজ্জ্বল করা ?

লোকে বলবে কি তোমাকে ? তুমি—তুমিও শেষকালে যুদ্ধ থেকে পালাবে ? এই কি বীরাঙ্গনার ব্যবহার ?

বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না, বীথি, তুমি এ-রকম পাশবিক স্বার্থপর

হয়ে উঠতে পারো। এ-মাসে তোমার টাকা আসতে দেরি হয়েছিলো বলেই সন্দেহ করেছিলুম, কিন্তু তবু বিশ্বাস করতে পারি না, এতোগুলি ক্ষুধার্ত গ্রাসের দিকে না তাকিয়ে সেই টাকা দিয়ে, অসম্ভব, সেই টাকা দিয়ে তুমি নিজের প্রসাধন করেছ।

তুমি জানো, পৃথিবীর সকলেই জানে, তুমি বিয়ের জন্যে তৈরি হওনি। তুমি পেঁচি-খেঁদির দলে নও, তুমি অসাধারণ, বিয়ের চেয়েও বৃহত্তরো উৎসব আছে তোমার জীবনে—সে তোমার কাজ, সে তোমার চরিত্র, সে তোমার আত্মত্যাগ।

ফেরৎ ডাকে, পত্রপাঠ চিঠি লিখবে, বীথি।

তুমি যে এ-সব তুচ্ছতা, এ-সব অসারতার অনেক উপরে তোমার মুখ থেকে সেই কথা জানার জন্যে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। এ যে মিথ্যা তাই তোমার সবল ব্যক্তিত্বে নির্ঘোষিত হয়ে উঠুক।

আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি, চারিদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছি না, তোমার মা এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। তুমি যদি এমন একটা কাণ্ড করো, তা হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন, বীথি।

আর তোমার ভাই-বোনগুলির মুখের দিকে যদি একবার চেয়ে দেখ।

বীথি চিঠিটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

সমরেশ সেদিনও এসেছিলো জিগগেস করতে, 'কোনো চিঠি আজ এলো ?'

বীথি নির্লিপ্ততায় বিচ্ছিন্ন হয়ে এলো, বললে, 'না।'

সমরেশ আজও এসেছিলো তেমনি এগিয়ে। গাঢ় গলায় বললে, 'কিন্তু চিঠির জন্যে আমরা আর কতোকাল অপেক্ষা করতে পারি ? আমাদের জীবনে সামান্য একটা চিঠি দিয়ে কি হবে ?'

বীথি বিস্মিত হবাব ধূসব একটি ভান কবলে, 'তাব মানে ? এ হচ্ছে সাদাসিধে একটা বিয়ে, জলজ্যান্ত সামাজিক একটা কাণ্ড, এ-ব্যাপারে আমাব বাবা-মাকে আমি ফেলতে পাবি নাকি ? কই, আপনিও তো পাবেননি দেখছি।'

'হোক বিয়ে,' সমবেশ তাব প্রবাহিত বক্তে যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো, 'তবু এটা আমাদেবই বিয়ে, আমাদেবই একটি অখণ্ড হয়ে ওঠা। এব মাঝে আব কারু প্রবেশ নেই, নেই আব কাক হস্তক্ষেপ। সমাজ-সংস্কার সমস্ত মিছে, শুধু আমবা দুজন ছাড়া পৃথিবীতে আব কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি চলো।'

'কি বাজে বকছেন।' বীথি সমস্ত ভঙ্গিতে অটল, দুর্ভেদ্য হয়ে দাড়ালো, 'আপনাব সঙ্গে নেহাত আমাব একটা বিয়েবই কথা হচ্ছে, আমি তো আব আপনাব সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি না।'

'তাব মানে ?'

'তাব মানে তাই। বিয়েব কথা কখনো ফলে, কখনো ফলেও না। না ফললেই লোকে পালিয়ে যায় না দেশ ছেড়ে।'

ছি ছি ছি, সমবেশ চলে গেলে বীথি বালিসে মুখে ঢেকে কান্নায লুটিয়ে পড়লো। ছি ছি ছি, এব চেয়ে তাব আব কোনো বড়ো উত্তব ছিলো না ? সমস্ত ব্যাপারটা সে দেখতে পেলো না আব কোনো পবিপ্রেক্ষিতে ? আব কোনো অনুভবেব সৌবভে ?

তাব এটা উত্তব না হয়ে কেন হলো না একটা জিজ্ঞাসা ? সামান্য প্রতিধ্বনি না হয়ে কেন হলো না প্রবল একটা আহ্বান ?

তা হলে—বীথি জানলা দিয়ে দূবেব আকাশেব দিকে চেয়ে বইলো স্তব্ধ হয়ে।

বলা বহুলতবো হবে, বীথি বাবার সে চিঠিটাব মুখোমুখি কোনো জবাব

দেয়নি। মনি-অর্ডারের কুপনে যেটুকু সে লিখতে পেরেছে ঠিক ততোটুকুই।

এবার টাকার সংখ্যাটা সাধ্যাতীত স্ফীত করে সে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবা অনেক দিন আগে তার কাছে একখানা গরদের চাদর চেয়েছিলেন মনে হচ্ছে, পার্শেল করে সেই একখানা চাদর, সামনে শীত এসে পড়েছে, মা'র জন্য ছোট একখানা আলোয়ান, ছোট ভাইবোনদের জন্যে রঙ-বেরঙের কতোগুলি ছিট।

জিনিস-পত্রের ফিরিস্তি দিয়ে পরে ছোট একটি লাইন :

'আমি ভালো আছি। আমার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না।'

মা-বাপের প্রাণ, চিন্তা না করলে পৃথিবী চলবে কেন?

বিনায়কবাবু হঠাৎ জরুরি একটা তার করে বসলেন :

'আমি আর তোমার মা আজ কলকাতা রওনা হচ্ছি। চিঠিটা আগেই পেয়ে থাকবে।'

কোন চিঠিটা—বীথি কিছু ঠিক বুঝতে পারলো না।

না, চিঠিটা দুপুরবেলার ডাকে এসে হাজির। কি না-জানি শুভ সংবাদ! বীথি চঞ্চল আঙুলে খামটা ছিঁড়ে ফেললো।

বেশি কিছু কথা লেখা নেই বলে বীথি উঠেছিলো উৎসাহিত হয়ে।

না, বিনায়কবাবুর বেশি কিছু লেখবার নেই :

'এবার আমরা তোমাকে নিয়ে কলকাতাতেই ছোট-খাটো একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকবো ভাবছি। কলকাতায় যেমন বড়োলোকের বাসা, তেমনি আবার গরিবেরও বস্তি আছে। গীতিকে তোমার ইস্কুলেই ফ্রি করিয়ে নিতে পারবে। তোমার পিসিমা শুধু এখানে থাকবেন, আমি মাঝে-মাঝে এসে দেখে-শুনে যাবো। এই ব্যবস্থাটা তুমি কি রকম মনে করো? একা-একা থেকে তোমার স্বাস্থ্যটা আজকাল ভালো থাকছে

না। তোমার মা তোমার কাছে যাবার জন্যে ভারি কান্নাকাটি লাগিয়েছেন। ফেরৎ ডাকে চিঠি দেবে।'
তার মতটা জানবারও তাঁদের আর তর সইছিলো না। আজ রাত্রে চিটাগং-মেলেই তাঁরা এসে পড়ছেন।

বীথি জানতো, রক্তের অক্ষরে-অক্ষরে জানতো, সমরেশ বিকেলবেলাই আজ একবার তার কাছে আসবে।
'কি, কোনো খবর এলো আজ?'
হাতের খবরের কাগজটা মুড়ে রাখতে-রাখতে বীথি বললে, 'কিসের খবর?'
'সেই ফলা না-ফলার খবর।' সমরেশ তার প্রশস্ত দুই কাঁধে উদ্ধত হয়ে দাঁড়ালো, 'আমি যে আজ রাতে দিল্লি যাচ্ছি, কিছু দিন আগেই আমাকে যেতে হচ্ছে।'
বীথি চোখ নামিয়ে বললে, 'এমন একটা কথা তো অনেক আগেই আমি শুনেছিলুম।'
'শুনেছিলে তো,' সমরেশ মৃত্যুর মতো তার কাছে এগিয়ে এলো, 'আমার সঙ্গে চলো।'
বীথি আগুনের মতো কেঁপে উঠলো, 'আমি যাবো কোথায়?'
'আমি যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। কোনোদিকে তুমি তাকিয়ো না, থাক যা যেখানে পড়ে আছে, তোমার জিনিসপত্র, তোমার অতীত-ভবিষ্যৎ, কোনোদিকে তোমার চাইতে হবে না। আমি আছি, তোমার কিছু ভয় নেই, বীথি, আমার সঙ্গে তুমি চলো।'
সমরেশ তার দিকে বুঝি একখানা হাত দৃঢ়তায় প্রসারিত করে ধরলো।
'পাগল! আমি যাবো কোথায়?' বীথি ভূতের মতো হেসে উঠলো,

'আজ বাবা-মা'রা সব এসে পড়ছেন।'

'এসে পড়ছেন?' সমরেশ লাফিয়ে উঠলো, 'তবে আর কি ভয়, বীথি! কেন, কেন আসছেন তাঁরা?'

'যাতে আমি এখান থেকে কোথাও না যেতে পারি।' বীথি খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'যাতে এবার থেকে আমার স্বাস্থ্যটা আর খারাপ না হয়।'

সমরেশ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। জীবন্ত মানুষে এমন করে কখনো হেসে উঠতে পারে সে জানতো না।

স্পষ্ট, প্রখর কণ্ঠে সে বললে, 'আসুন তাঁরা, তবু তুমি চলো। হ্যাঁ, আমি বলছি, তুমি চলো। তোমার সমস্ত সংসার যাক মুছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে, তবু তুমি এখানে এমন করে বসে থেকো না। তাঁদের বংশের মুখোজ্জ্বল করা তোমার কথা নয়, তুমি একবার আমার মুখের দিকে তাকাও, দেখ, সেইখানে তোমার মুখ আজ কি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!'

বীথি এক মুহূর্ত হয়তো দুলে উঠলো, তার আঁচলে হয়তো লাগলো একটু হাওয়ার চাঞ্চল্য, তার রক্ত উঠলো লাল হয়ে।

এক মুহূর্ত।

বীথি আবার তেমনি অদ্ভুত, অশরীরী হেসে উঠলো। শুভ্রাযিত কঙ্কালের গলায় বললে, 'না, আপনি ভুল করছেন।'

'ভুল করছি?'

'হ্যাঁ, আমি সেই জাতের মেয়ে নই।'

'মেয়েদের মধ্যে কটা আবার জাত আছে?' সমরেশ ব্যাকুল হয়ে বললে, 'এ কদিনে তোমার এ কি চেহারা হয়ে গেছে, বীথি? একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ। না, তুমি চলো, আমি—আমি তোমাকে ডাকছি।'

'না,' শত গম্ভীর হয়েও বীথি তার মুখের সেই নিরবয়ব হাসি কিছুতেই

মুছে ফেলতে পারলো না, 'বিকেলের ট্রেনে মেয়ের কাছে তার বাবা-মা'র আসবার কথা থাকলে সে-মেয়ে রাতের ট্রেনে শুধু শুধু পালিয়ে যেতে পারে না।'

'শুধু-শুধু কোথায় ? তুমি কি কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না, বীথি ?'

'না,' বীথি এবার শব্দে ছিটিয়ে পড়তে লাগলো, 'বুঝতে পাচ্ছি না। এ সংসারে বিয়ের জন্যে আমি তৈরি হইনি। আমার আরো ঢের বড়ো কাজ করবার কথা। স্টেশনে গিয়ে চিটাগং-মেলটা আমাকে আজ য়্যাটেণ্ড করতে হবে।'

জোরে-জোরে পা ফেলে সমরেশ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

দরজাটা আধখানা মেলে বীথি তাকে শেষবার দেখলে।

হঠাৎ ঘরের নিঃশব্দতায় ফিরে আসতেই বীথির সমস্ত পৃথিবী যেন গেলো শূন্য হয়ে।

কি আর সে এখন করবে, আস্তে-আস্তে সেই প্রেতায়িত বিবর্ণ মুখে সে তার আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ তরতর করে নেমে এল সে সিঁড়ি দিয়ে। চিটাগং-মেল কখন আসে ইস্টিশানে ?

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড কোথায় ? এমনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেই পাওয়া যাবে না ট্যাক্সি ? কে জানে। যখনকার যা তখন তা ঠিক পাওয়া যায় না। সব বাড়ির মোটর, একটাও ট্যাক্সি নয়। কি হবে ? হয়তো এতক্ষণে পৌছে গিয়েছে চিটাগং-মেল।

চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করছে বীথি।

সমরেশ কাছেই ছিল যেন কোথায়! যেন তাড়িয়ে দিলেও উড়ে যেতে পারেনি। হয়তো বা পায়নি তার অবকাশ।

হয়তো ছোট্ট একটু চোখোচোখি হল।

'কি খুঁজছো ?' সমরেশ এগিয়ে এসে জিগগেস করলে।

'ও, আপনি ! আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারেন ? শিগগির—'

'কেন ?'

'শেয়ালদা যাব। চিটাগং মেলের য়্যারাইভ্যাল কখন ? সে-ট্রেনেই বাবা-মা'রা আসছেন সব। ওঁদের গিয়ে এখানে, আমার বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। আমি না গেলে বাড়ি চিনবেন কি করে ? দেখুন না একটা কিছু পান কিনা—'

'এখানে ট্যাক্সি কোথায় ? স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত হাঁটতে হবে। চলো না, হাঁটি, দেখা যাক—'

'অদ্দূর পর্যন্ত যাবার বোধ হয় সময় নেই। ট্রেন বোধ হয় এসে গেছে এতক্ষণে। ঠিক টাইমিংটা জানি না যে—'

'উড়ে তো আর যেতে পারবে না ! চলো না, চলতে-চলতে পাওয়া যাবে হয়তো।'

যা বলেছে-সমরেশ, চলতে-চলতেই মিলে গেল।

ট্যাক্সির দরজা খুলে ত্বরিতভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল বীথি।

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল সমরেশ, হঠাৎ বীথি বললে, 'ও কি ! আপনিও আসুন না—'

'আমি কোথায় যাব ?'

'যেখানে আমি যাচ্ছি—স্টেশনে।'

উঠে বসলো সমরেশ। চলতে চলতে যা মেলে, যতটুকু মেলে, তাই জীবনের পাথেয়।

শেয়ালদা যেতে হলে ট্যাক্সির ডাইনে বেঁকবার কথা, হঠাৎ বীথি নির্দেশ দিলে, 'বাঁয়ে।' তার মানে মাঠের দিকে, গঙ্গার দিকে।

'ওদিকে কি ?' সমরেশ চমকে উঠল।

‘ওদিকেই আমাব স্টেশন। গাড়ি ঘুবে ঘুবে শেষকালে তোমাব বাড়ির দরজায গিয়ে দাঁড়াবে। সেইখানেই আমাব টার্মিনাস। একটু বাংলা কবে বলি—আমাব ইতি, আমাব প্রাপ্তি—’

বিস্ময়ে পাংশু হয়ে গেল সমবেশ। পাথব হঠাৎ পদ্ম হযে উঠল নাকি?

বীথি তাব বিশাল সবল নিষ্পলক চোখ ছুটি তুলে ধবল সমবেশেব দিকে। বললে, ‘আমাব চোখেব দিকে তাকাও, দেখ, সেইখানে তোমাব মুখ কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।’

উপন্যাসে প্রেমের কাহিনী

গল্প শোনাব প্রবৃত্তি মানুষেব চিবকালেব। বাববাব শুনে, বাবেবাবে শুনিয়ে তাব অতৃপ্তি নেই। আব গল্পের মধ্যে গল্প হচ্ছে নবনাবীর প্রেমেব গল্প। এবিষযে কৌতূহল এত আদিম, এত অধীব যে গল্পে নাবীঘটিত কোনো চিত্তবিক্ষেপেব ব্যাপার থাকলেই তাতে অসংখ্য পাঠক হাবুডুবু খেতে থাকেন। এই দুর্বলতার সুযোগ নিযে প্রবৃত্তিব লালাসিক্ত সুড়ঙ্গ পথে কাহিনী আকাবে কত বিষ যে ঢালা হয তা বলে শেষ করা যায না। অনেকেব তাই ধাবনা প্রেমেব গল্পে, বিশেষত আধুনিক লেখকেব লেখা প্রেমেব গল্পে লোকসমাগমে অনুচ্চার্য অথচ গোপনে সুখপাঠ্য কেলেঙ্কারিব বিষয থাকবেই। অথচ অস্বাভাবিক না হযে এই প্রেমের রূপ কত আশ্চর্য বিচিত্র হতে পাবে। কোথাও স্নিগ্ধ কোথাও ক[illegible] লাবণ্যময়, নির্দয় বা নিস্তব্ধ গম্ভীব। কোথাও আবেগে বোমাঞ্চিত, কোথা[illegible] গভীবতায শান্তস্থির। এত বিচিত্র যে হাজাব লোক হাজাব বার ঘুবিযে ফিবি[illegible] সেই এক কথা বললেও প্রতিবাবে তা নতুন লাগে সবস লাগে। অসাধাব[illegible] প্রতিভার অধিকাবী না হলে আদিরস বর্জিত গল্পে উপন্যাসে সিদ্ধি প্রা[illegible] অসাধ্য।

কিন্তু আজ আমরা এ বিষযে যতই কুসংস্কাব মুক্ত হই না কেন, সহজ কথা সহজ (অবশ্যই সবস) কবে বলাব পক্ষে একদিন সাংঘাতিক বাধা ছিল। নরনারীর জটিল সম্পর্ক নিযে স্বাভাবিক ভাবে এদেশে যখন লেখা আবম্ভ হল তখন— আধুনিক উপন্যাসের সেই প্রথম যুগে—শুচিবাযুগ্রস্থদের ছিছিক্কারে দেশ ভরে গিযেছিল। এই দুঃসাহস যে বিদেশী দৃষ্টান্তপ্রসূত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ সন্দেহও আজ নেই যে এই পথেই সাহিত্যে আর ভাষায় প্রকৃত বলিষ্ঠতা আসতে পাবে। সমবেত ধিক্কার সত্ত্বেও সেদিন যাঁরা বাংলা গল্প

উপন্যাসের মোড় ফিরিয়েছিলেন—অচিন্ত্যকুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

আধুনিক গল্প উপন্যাস পড়ার সময় এ কথাটা নিশ্চয়ই মনে রাখা চাই যে গল্প উপন্যাস হবে সমকালীন জীবনধারার প্রতিচিত্রণ। সমসাময়িকতা না থাকলে কাহিনী রোমান্সের রূপ নিতে পারে, কিন্তু সে হয় আরেক জিনিস। বলা বাহুল্য এই সমসাময়িকতার ছাপ থাকে বলে লেখককে নীতি দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। প্রকৃত লেখক মাত্রেই বিচারক হতে চান না। ভালো মন্দের পক্ষ অবলম্বনের দায়িত্ব নিতে গেলে সমাজহিতৈষী নীতিধ্বজ হতে হয়। কাহিনীর পক্ষে দরকার অথচ সংস্কারবশে অপ্রিয় এমন অনেক সত্য বিষয়েরই তাঁকে অবতারণা করতে হয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে যা অনেক সময় প্রীতিকর হয় না কিন্তু অপ্রীতিকর খণ্ডতাকে বর্জন করলে জীবনের সমগ্রতার পক্ষে হানি হবেই।

আধুনিক গল্প উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো করে এই গুণটাই (লক্ষণও বলতে পারেন!) চোখে পড়ে যে তার চরিত্রেরা আমাদেরই চারপাশের চেনাজানা দশজনের একজন হলেও হতে পারত। নিছক বাস্তবিকতার মধ্যে রসসৃষ্টির জন্য যেটুকু অত্যুক্তি করতে হয় সেটা সমস্ত শিল্পসৃষ্টিরই গোড়ার কথা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নরনারীর সম্পর্ককে অসংখ্য বিচিত্র কোণ থেকে দেখেছেন দেখিয়েছেন। এজন্য প্রচলিত ভাষার উপর নির্ভর করলে চলত না বলে রীতিমতো একটা ভাষাও তৈরি করতে হয়েছে তাঁকে। ভাষা নিয়ে তাঁর অসংখ্য পরীক্ষার কিছু কিছু ফল আজ প্রচলিত সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে গেল।

তাঁর প্রথম প্রচলিত উপন্যাসের নাম বেদে। এই বইয়েই তাঁর রচনার প্রায় সব বৈশিষ্টতাগুলি উপস্থিত। কি আশ্চর্য গল্প। অনেকবার পড়লেও পুরনো হতে চায় না। চালচুলোহীন ভবঘুরে একটি ছেলে পৃথিবীর গ্রহণলাগা ছায়ার অংশে ধীরে ধীরে বড়ো হল। বড়ো হল মানে তার ভাগ্য খুলে গেল না। হলে তাতে আর স্বাভাবিকতার লেশ থাকত না। বড়ো হল বয়সে, বয়সের অভিজ্ঞতায়। এই ভবঘুরে ছেলের জীবনে বালককাল থেকে যৌবন পর্যন্ত একে একে ছয়টি বিচিত্র মেয়ের আবির্ভাব নিয়ে এই কাহিনী। প্রচলিত অর্থে কাহিনীর সমস্ত অধ্যায়কে প্রেম বলা যায় কিনা সন্দেহ। আহ্লাদি, আসমানী, বাতাসী, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না, মৈত্রেয়ী—কেউ অনাথ আশ্রমের আশ্রিতা, কেউ ধনী প্রাসাদের আদরিণী কন্যা—এই ছয়টি মেয়ের সঙ্গে নায়কের বিভিন্ন বয়সে যে কোমল মধুর করুণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাকে যে নামই দেওয়া যাক তাতে তার

রহস্য কমে না। আধুনিক উপন্যাসের এই প্রথম যুগে উত্তর-ইউরোপীয় গল্প-লেখকদের তীর্যক ছায়া অনেকেরই চোখে পড়বে। কিন্তু ঈষৎ ভিন্ন চোখ নিয়ে জীবনকে দেখতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার যে এক নিঃশ্বাসে মন কেড়ে নেওয়া অপরূপ কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন, তা এদেশেরই।

নারীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কখনো আবার মায়ের ছায়া এসে তাকে জটিল করে তুলতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয় উত্থাপন করাও অনেকের চোখে পাপ। অথচ **জননী জন্মভূমিশ্চ** উপন্যাসে এটাই হচ্ছে বিষয়। একদিকে জননীর অবুঝ অন্ধ স্নেহ, আর একদিকে স্ত্রীর স্বাভাবিক আকর্ষণ। এই বিরোধের ফলে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়, সে ধরনের অশান্তি তো জীবনে হামেশাই লেগে আছে। কিন্তু এই বিতৃষ্ণার বিষয় নিয়ে কেমন সরস গল্প হওয়া সম্ভব, ত্রিশ বছর আগে তা কারো কল্পনায় ছিল না।

অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে সমসাময়িক কালের আর মনের ছাপ তো আছেই, আবার বাঙলাদেশের চেনাজানা বহু দৃশ্য এই সব কাহিনীর পটভূমি হয়ে উজ্জ্বলতর হয়েছে। এ বিষয়ে চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে **প্রথম প্রেমে** পদ্মায় স্টিমার যাত্রার দৃশ্যটি। যৌবনোচ্ছল একটি তরুণী আর প্রাণচঞ্চল একটি তরুণ—তাদের প্রথম প্রেমের যে তীব্র মধুর রহস্য লেখক উন্মোচিত করেছেন, কুচুরী পানা ভাসা বুকজোড়া চরজাগা, তবু প্রবল, পদ্মার বিশাল বুক ছাড়া কোথাও তাকে ধরতো না।

এই সমস্ত বিচিত্র কাহিনীর হাত ধরে এগিয়ে গেছে তাঁর ভাষা। শুধু গল্পেই যারা সন্তুষ্ট, এ ভাষা তাদের পক্ষে বাধা হয় না, সহায় হয়। আবার ভাষা-শিল্পে যাদের আগ্রহ, নিছক গল্পের নেশাই তাদেরও এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমন বলিষ্ঠ ভাষা তেমনই বলিষ্ঠ এই সব চরিত্রের হৃদয়াবেগ আর প্রাণের চঞ্চলতা। অনুভূতির এই প্রখরতা আছে বলেই সে আবেগ সুস্থ। সসংকোচে গা বাঁচিয়ে, চলতি সমাজের মুখ রক্ষা করে, মিষ্টি মিষ্টি গল্প লেখা দুরূহ ব্যাপার নয়। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার যে বিপজ্জনক নৈতিক গিরি সংকটের ধার ঘেঁষে অনায়াসে পার হয়ে যান অসাধারণ নিপুণতা আর শিল্পীর **আত্মবিশ্বাস না** থাকলে সে পথে উপন্যাসের অপমৃত্যু প্রায় নিশ্চিত বলা চলে।

যাঁরা লেখক তাঁরা জানেন এ জিনিস কত কঠিন। **যাঁরা পাঠক তাঁরা বোঝেন** এ জিনিস কত তৃপ্তিকর।